ভেনডেটা

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ মাঘ ১৩৫৯

প্রকাশক। সমীরকুমার নাথ। নাথ পাবলিশিং। ২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস।

কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদপট। গৌতম রায়

মুদ্রাকর। অজিতকুমার দত্ত। দত্ত প্রিন্টিং ওয়ার্কস। ৫০ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট

কলকাতা ৭০০০০৯

শ্রীযুক্ত শান্তিরঞ্জন গুপ্ত

প্রিয়বরেষু

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

ক্যামেলিয়া

সূর্যমহল

॥ এক ॥

স্বর্ণেন্দু, এখানকার বাস আমার উঠল।

এখানে আজই আমার শেষরাত্রি—শেষরাত্রিরও সবটুকু নয় কারণ এ রাত্রি শেষ হবার আগেই আমাকে এখান থেকে রওনা হতে হবে।

মনে পড়ছে এই তো সেদিন এক রাত্রিশেষেই চিরদিনের পরিচিত গৃহকোণটি ছেড়ে এক অনির্দিষ্ট আশ্রয়ের সন্ধানে এখানে এসে পা দিয়েছিলাম। এবং আশ্চর্য ভাবেই আজকের এই আশ্রয়টি পেয়ে গিয়েছিলাম।

মনে হয়েছিল, বাঁচলাম—নিশ্চিন্ত হলাম।

কিন্তু বিধাতা পুরুষ বোধহয় সেদিন ঐ মূহুর্তটিতে অলক্ষ্যে বসে হেসেছিলেন—তাই পুরো পাঁচটা বছরও গেল না—আবার আজ রাত্রে সেদিনকার মত এক অনির্দিষ্ট পথে পা বাড়াতে চলেছি।

আর মজা কি জান—সেদিন আমার ঘর ছাড়ার পিছনে যাদের কুটিল জঘন্য চক্রান্ত ও নীচতা ছিল আজও ঠিক তারাই আমাদের ঘর ছাড়া করল।

পথে আবার বেরুতে বাধ্য করল।

কিন্তু বলতে পার স্বর্ণেন্দু, আজ মানুষের মনের একটা দিক মহাশূন্যপথে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে যখন যাতায়াতের স্বপ্ন দেখছে তাদেরই মনের অন্য দিকটায় তখন এত অন্ধকার কেন?

নীচতায় কুশ্রীতার এমন হলাহল ফেনিয়ে ফেনিয়ে ওঠে কেন?

অবিশ্যি তোমাকে আমি সেই দলে টানছি না।

তুমি তো তাদের মধ্যে থেকেও কলুষিত নও—তাদের মধ্যে থেকেও তাদের কেউ নও—তাই তো অকুণ্ঠ ধন্যবাদ—অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা তোমার প্রতি আমার যেমন চিরদিন আছে তেমনি থাকবেও চিরদিন।

সমস্ত মানুষের প্রতি আমার সমস্ত অবিশ্বাস-অশ্রদ্ধার মধ্যে তুমিই

যে আমার একমাত্র সান্ত্বনা।

সমস্ত মিথ্যার মধ্যে একমাত্র সত্য।

তাই যতদূরে যেখানেই যাই না কেন ধ্রুবতারার মত তোমারই দিকে যে একমাত্র তাকিয়ে আছি সর্বক্ষণ।

কুন্তী তার কোয়ার্টারে বসে চিঠিটা লিখছিল।

রাত অনেক হয়েছে।

অদূরে শয্যায় শুয়ে চার বছরের মেয়ে সীতা ঘুমাচ্ছে। এমন ছটফট করে সারাটা রাত মেয়েটা ঘুমের মধ্যে—কিছুতেই গায়ে লেপটা রাখে না।

কেবলই সরে সরে যায়—

আর কুন্তীর ঐ এক কাজ—সেই লেপ টেনে টেনে ঠিক করে দেওয়া মধ্যে মধ্যে সারাটা রাত ধরে সজাগ থেকে।

আশ্চর্য—মেয়েটার শীতবোধও যেন তেমন নেই।

দিব্বি উদলো গায়ে এই শীতের মধ্যেও ঘুমিয়ে থাকে।

এই কয়দিন ধরে আবার কি প্রচণ্ড হয়েই না শীতটা পড়েছে। গতকাল ও পরশু কুন্তী তো স্পষ্টই দেখেছে—বাইরে ঐ মাঠের উপর পাতলা বরফের মত শিশির জমে আছে।

এই ঘরের পশ্চিম দিককার জানালার কাচ দুটো সীতা কয়েকদিন আগে খেলতে খেলতে কেমন করে যেন ভেঙ্গে ফেলেছে একটা বল ছুঁড়ে—সেক্রেটারী নীলমাধববাবুকে জানায়নি কথাটা কুন্তী—

জানায়নি তার কারণ প্রথমত সে চলেই যাচ্ছে আর দ্বিতীয়ত নীলমাধববাবু হয়ত কয়েকটা বাঁকা বাঁকা কথা শুনিয়ে দিতেন।

বাইরের ঠাণ্ডা তো আটকাতে হবে তাই ঐ জানালার ফাঁকগুলো খবরের কাগজ কেটে আঠা দিয়ে এঁটে দিয়েছিল কুন্তী, কিন্তু গতকাল কারা যেন ইট মেরে তাও আবার ফাটিয়ে দিয়েছে।

ফাটা আর ভাঙ্গা জানালার কাচের মধ্যে দিয়ে হিমতীক্ষ্ণ হাওয়ার একটা প্রবাহ ঘরের মধ্যে এসে যেন ঢুকছে॥

জানালার পর্দাগুলো পর্যন্ত নেই—বিকেলেই সেগুলো খুলে বাক্সের মধ্যে ভরে দিয়েছিল কুন্তী।

সীতার গায়ের লেপটা আবার সরে গিয়েছে।

কুন্তী হাতের কলমটা টেবিলের ওপরে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল।

লেপটা সীতার গায়ে টেনে দিয়ে আবার এসে চেয়ারটায় বসল।

আপনা থেকেই যেন ঘরের চারিদিকে আবার নজর পড়ে কুন্তীর—ফিরে ফিরে তাকায় ঘরের চারিদিকে।

প্রায় দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে এই ঘরটিতে সে আছে।

এক-আধ দিন তো নয়—দীর্ঘ পাঁচ পাঁচটা বছর।

কালও ছিমছাম ছিল সমস্ত ঘরটা—যেই যখন তার ঘরে এসে পা দিয়েছে, বলেছে, তোমার ঘরের মধ্যে পা দিলেই কি মনে হয় জান কুন্তীদি—

কি—

এ ঘরের প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে একটা সযত্ন পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর মমতা যেন সর্বত্র জড়িয়ে আছে—

আঃ, মেয়েটা আবার গায়ের লেপটা ফেলে দিয়েছে।

কুন্তীকে আবার উঠতে হ'ল—আবার সীতার গায়ের লেপটা ঠিক করে দিতে হ'ল।

ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়ান চুলগুলো কপালের ওপরে গালের ওপরে এসে পড়েছে, সযত্ন মমতায় এলোমেলো চুলগুলো সীতার ঠিক করে দিল কুন্তী।

অদ্ভুত একটা আলগা শ্রী আছে মেয়েটার চোখে মুখে।

মায়ের রঙ পায় নি বটে তবে মা'র বাঁ-গালের তিলটা আছে—ঠিক বাঁ-গালেই সীতার।

কালো তিলটা।

আবার টেবিলের সামনে এসে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল কুন্তী।

গোছগাছ যা করবার সবই করে রেখেছে বিকেলে।

সাঈদা এসেছিল তাকে সাহায্য করবার জন্য। তার সাহায্যেই

গোছগাছ সব সেরে রেখেছে কুন্তী সন্ধ্যায়।

ঐ সাঈদা মেয়েটি বড় ভাল।

মেয়েটার মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা যেন মর্যাদাবোধ আছে।

মুসলমানের মেয়ে—স্বামীটা একটা দুশ্চরিত্র মাতাল—কবে বছর চারেক আগে ওর বয়স যখন মাত্র নাকি আঠোর কি উনিশ তখনই তালাক হয়ে গিয়েছিল।

তারপর আবার ইচ্ছা করলেই হয়ত সাঈদা বিয়ে করতে পারত—বিশেষ করে ঐ ইসমাইল ছেলেটিকে, কিন্তু করে নি।

করবেও না কোনদিন।

অথচ ইসমাইল ছেলেটি সত্যি ওকে ভালবাসে।

ইসমাইলকে অনেকবার দেখেছে কুন্তী। এখানে আসে মধ্যে মধ্যে সাঈদার সঙ্গে দেখা করতে, চমৎকার ছেলেটি, ভারী নম্র—ভারী মিষ্টি—

দেখতেও কালোর উপর মোটামুটি মন্দ নয়—চাকরি-বাকরি করেনা, কলকাতা শহরে নিজের কাঠের ক্যাবিনেটের ব্যবসা আছে পার্ক স্ট্রীট না কোথায়।

বেশ ফলোয়া ব্যবসা।

ওদের পরস্পরের পরিচয় প্রায় বছর দুয়েকের বেশী হবে, এবং একটা ঘনিষ্ঠতা যে গড়ে উঠেছে ওদের পরস্পরের মধ্যে তাও জানে কুন্তী—

তবু—

তবু সাঈদা যেন কেমন নিস্পৃহ ইসলামের ব্যপারে।

প্রথম প্রথম কুন্তী ভেবেছে বুঝি সাঈদা ওকে যাচাই করে নিচ্ছে—পরে কিন্তু মনে হয়েছে তা নয়।

তাই ও সাঈদাকে না জিজ্ঞাসা করে পারেনি—

মানুষটা কিন্তু সত্যিই ভাল সাঈদা—

ত'হ কি—

ওকে বিশ্বাস বোধহয় করতে পার—

কিন্তু সাঈদা বলে, পুরুষ জাতটাকে আর আমি বিশ্বাস করি না কুন্তীদি—

শুধিয়েছিল কুন্তী, কেন রে?

না—বিশ্বাস করি না—

সবাই ত আর মনসুর সাহেব হয় না? কুন্তী বলেছিল।

সবাই তাই—সব পুরুষের মুখেই জেন, থাকে একটা করে মুখোশ।

কিন্তু ও তো তোকে সত্যিই ভালবাসে সাঈদা।

সাঈদা বলেছিল, ওটা কেতাবী কথা—গল্পের কথা। শুনতেই ভাল লাগে—সত্যিকারের জীবনে ওর কোন মূল্য নেই—

ইচ্ছা হয়েছিল সে সময় কুন্তীর যে বলে, না রে, না—তুই জানিস না তাই বলছিস—আছে রে, ভালবাসা আছে—ও বস্তুটা না থাকলে পৃথিবী এতদিন অরণ্যে পরিণত হ'ত—মরুভূমি হয়ে যেত।

কুন্তী আবার কলমটা তুলে নেয়—চিঠিটা শেষ করবার জন্যই বোধ করি।

সাঈদা বিশ্বাস হারিয়েছে তাই ওর বিশ্বাস নেই কিন্তু আমি বিশ্বাস করি স্বর্ণেন্দু—

ভালবাসা আছে—

আর ভালবাসা আছে বলেই আজও আমি বেঁচে আছি—

আমার সীতা বেঁচে আছে।

আর ভালবাসা না থাকলে এত বড় জোর তোমার ওপরে খাটাতাম কি করে আমি বলত।

তাই মেয়েটার জন্য সত্যি দুঃখ হয় আমার।

বড় সরল, বড় সহজ মেয়েটা—কিছুটা বোধ করি ঐ কারণে নির্বোধও।

আশ্চর্য।

দেখ আমার নিজের দুঃখের শেষ নেই। অথচ আমি সাঈদার দুঃখের কথা কেনিয়ে কেনিয়ে লিখে চলেছি তোমার কাছে।

অনেক দিন পরে এই চিঠি তোমাকে আমি লিখছি—

তা বোধ করি বছরখানেক তো হবেই—কি বল!

সেই যেবার তুমি বাঁকুড়ায় বদলী হয়ে যাও—আমার চিঠিটা ঘুরতে ঘুরতে তোমার বাঁকুড়ার নতুন ঠিকানায় গিয়ে পৌঁচেছিল।

কে জানে এক বছর বাদে আবার চিঠি দিচ্ছি—তুমি আজও বাঁকুড়ায়ই আছ কি না—যদি নাই থাক—তাহলেও হয়ত আমার আগেকার চিঠি-টার মত ঘুরতে ঘুরতে তোমার হাতে গিয়ে একদিন এটা ঠিকই পৌঁছবে।

আচ্ছা সেই পুরনো কথাটা আজ আবার যদি বলি রাগ করবেনা তো—

রাগ করো না—লক্ষ্মীটি—

এবারে একটা বিয়ে কর।

বিশ্বাস কর, সত্যিই সংবাদটা পেলে আমি খুশি হব। এবং আমার চাইতে খুশি আর কেউ হবে না জেন।

আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে কেন তুমি জড়িয়ে থাকবে সারাটা জীবন এমনি করে—

যে দুর্ভাগ্যের কোন অন্ত নেই—কোনদিন শেষ হবে না—তার জন্য তুমি কেন এমনি করে একক জীবনযাপন করবে।

এতে যে আমার কি লজ্জা করে তা কি তুমি বোঝ না?

মা—

চমকে ফিরে তাকাল কুন্তী।

কখন সীতা শয্যার উপর উঠে বসেছে—ওরই দিকে চেয়ে আছে।

একটু জল খাব মা—

কুন্তী আবার কলমটা রেখে উঠল।

পাশেই টেবিলের ওপরে কাচের গ্লাসে জল ঢাকা ছিল—জলের গ্লাসটা হাতে নিয়ে সীতার সামনে ধরতেই সীতা নিজেই ছোট ছোট দু'হাতে গ্লাসটা ধরে এক চুমুকে অনেকটা জল খেয়ে আবার নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে বোধ করি ঘুমিয়েও পড়ল।

টেবিলের ওপরে রক্ষিত ঘড়িটার দিকে তাকাল কুন্তী—রাত মাত্র পৌণে দুটো।

ট্রেনের এখনও প্রায় তিন ঘন্টারও বেশী দেরি আছে।

ট্রেনটা ভোর পাঁচটা দশে।

স্টেশন অবিশ্যি এখান থেকে মাইল দেড়েক মত হবে এবং বেরুতেও হবে সাড়ে চারটে নাগাদ, নচেৎ ট্রেনটা ধরা মুস্কিল।

টিকিট কাটার ব্যাপার আছে—জিনিসপত্রও সঙ্গে একেবারে যে নেই তাও নয়।

এর আগের বার তো ছোট একটা সুটকেস ছাড়া কিছুই ছিল না।

সেই সুটকেস ও দুই মাসের সীতাকে নিয়ে এখানে এসে অনীতার ওখানে উঠেছিল।

অনীতা তো ওকে দেখে অবাক।

সঙ্গে আবার দুই মাসের শিশু সীতা—

সীতা অবিশ্যি তখনও ওর নামকরণ হয় নি—খুকীই ছিল ওর নাম।

এখানে অনীতার স্বামী ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার ও জানত।

অনীতার স্বামী প্রভাস সেদিন অবিশ্যি বাড়ীতে ছিল না। টুরে গিয়েছিল।

॥ দুই ॥

রাত তখন প্রায় চারটে হবে।

সেও এমনি একটা কন্‌কনে শীতের শেষ রাত।

পৌঁছাবার কথা রাত দেড়টায় কিন্তু ট্রেনটা লেট করে পৌঁচেছিল প্রায় রাত তিনটের সময়।

একবার মনে হয়েছিল ঐ অত রাত্রে, ঐ সময় কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে যাওয়া ঠিক উচিত হবে না—কিন্তু দু'মাসের কচি বাচ্চাটা সঙ্গে—ওয়েটিং রুমের দরজাটাও কিছুতেই খোলান গেল না—অনন্যোপায় হয়েই তখন একটা সাইকেল রিক্‌শা ভাড়া করে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে হাজির হয়েছিল অনীতার বাসায়।

দরজা-জানালা বন্ধ—শীতের রাত, সবাই ঘুমে অচেতন তখন।

রিক্‌শাওয়ালাটা অনেক ডাকাডাকি করবার পর চাকর এসে দরজা খুলে দেয়।

চাকরটাও অবাক—কে রে বাবা এই শীতের রাত্রে একটা বাচ্চাকে নিয়ে সাধারণ বেশে ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের বাড়ীতে এল।

অবিশ্যি অবাক হবারই কথা চাকরটার।

অতি সাধারণ বেশেই গৃহ ত্যাগ করে এসেছিল কুন্তী।

সাধারণ একটা মিলের কালো পাড় শাড়ী, হাতে একগাছি করে সরু সোনার রুলি—গায়ে একটা শাল জড়ান। পায়ে চপ্পল।

ভ্রূ কুঁচকে শুধায় চাকরটা, কি চাই—

এটা ইঞ্জিনীয়ার মিঃ মিত্রের কোয়ার্টার?

হ্যাঁ—কিন্তু সাহেব তো বাসায় নেই—

কেউ নেই আর বাসায়?

আছেন—মেমসাহেব আছেন—

রিক্‌শাওয়ালার ডাকাডাকিতে আগেই অনীতার ঘুমটা ভেঙ্গে গিয়েছিল—সেও বাইরের ঘরে এসে প্রবেশ করে।

কে রে বিশু?

অনীতার গলার সাড়া পেয়ে ভৃত্য বিশ্বনাথ ও সেই সঙ্গে কুন্তীও ঘুরে তাকায়।

প্রথমটায় চট্‌ করে অবিশ্যি চিনতে পারে নি অনীতা কুন্তীকে দেখে।

মাথায় ঘোমটা, শাল জড়ান বুকে শিশু—তা ছাড়া দেখা প্রায় বছর চারেক বাদে।

সেই যে চার বছর আগে আই. এ. পড়তে পড়তেই বিলাত-ফিরত ইঞ্জিনীয়ার প্রভাস মিত্রের সঙ্গে অনীতার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, তারপর তো আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি তুজনার মধ্যে।

কে?

কুন্তীও চেয়ে ছিল অনীতার মুখের দিকে।

শাড়ীর উপরে স্লিপিং গাউন জড়ান—এবং চার বছরে বেশ মুটিয়েছিল অনীতা—

অনীতা—

কে—কুন্তী চৌধুরী না!

হ্যাঁ—চিনতে পেরেছিস তাহ'লে—আমিতো ভেবেছিলাম—

নিশ্চয়ই—কিন্তু—

সব কথা বলব—ঠাণ্ডায় বাচ্চাটা একেবারে নেতিয়ে পড়েছে—যদি একটু গরম জলের ব্যবস্থা করতে পারিস—

নিশ্চয়ই—আয়—

অনীতার শোবার ঘরটা বেশ গরমই ছিল।

সেই ঘরে ঢুকে অনেকটা সুস্থ বোধ করে কুন্তী।

তারপর গরম জলে বাচ্চাটাকে সেক দিয়ে একটু গরম হরলিকস্ খাইয়ে নিশ্চিন্ত হয়।

অনীতার নির্দেশেই কুন্তী বাচ্চাটাকে শয্যায় শুইয়ে দেয়।

তারপর দু'জনে দু'কাপ গরম গরম চা নিয়ে মুখোমুখি বসে।

অনীতা তার বান্ধবী কুন্তীকে সাদর আহ্বান জানালেও তার মনের মধ্যে কুন্তীর ক্রোড়ের ঐ শিশুটি এবং তার বেশ-ভূষা বিশেষ করে মাথায় বা কপালে সিন্দুরের কোনও চিহ্ন মাত্র বা তেমনি হাতে কিছু সধবার চিহ্ন শাঁখা বা লোহা কিছুই নেই দেখে সেই সব কিছু জড়িয়েই কেমন একটা সংশয় তাকে যেন পীড়া দিতে থাকে।

অথচ বলতেও পারছিল না মুখ ফুটে কথাটা, কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকছিল—একটা লজ্জাবোধ যেন ওকে বিব্রত করে তুলছিল।

অবশেষে জিজ্ঞাসাই করে ঘুরিয়ে কথাটা।

তারপর বিয়ে করলি কবে? কর্তাটি কোথায়? কি করে রে—

অনীতার প্রশ্নে মুখ তুলে তাকাল কুন্তী।

বললে, বিয়ে?

হ্যাঁ, কোথায় হলো—

কুন্তী কেমন যেন একটু ম্লান হাসি হাসে।

অনীতা শুধায়, হাসচিস যে—বিয়ে কবে হলো—। আর একাই বা

কেন ঐটুকু বাচ্চাকে নিয়ে—

কোথায় আর সে সৌভাগ্য হ'ল ভাই—

তবে ?

কি তবে ? ঐ বাচ্চা—অবিশ্যি ও আমারই বাচ্চা।

কথাগুলো কুন্তীর মুখ থেকে উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যে অনীতার মুখখানা গম্ভীর থমথমে হয়ে উঠেছিল কেমন, সেটা কুন্তীর দৃষ্টি এড়ায় নি।

কুন্তী পূর্ববৎ মৃদু হাসি হেসে বলে, খুব আশ্চর্য লাগছে তো—

না—মানে—

বলতে হবে না—বুঝতে কি আর পারচি না এই মুহূর্তে তোর মনের অবস্থাটা—তারপর একটু হেসে বলে, মনে হচ্ছে ঘৃণাও নিশ্চয় হচ্ছে আমার ওপরে—

ঘৃণা—

হ্যাঁ—ঘৃণা হচ্ছে না! বিয়ে হয় নি অথচ বাচ্চা—মা হয়ে গেলাম।

অনীতা একেবারে চুপচাপ, মুখে কোন কথা নেই।

দুজনাই কিছুক্ষণ যেন একেবারে বোবা। তারপর অনীতাই কথা বলবার চেষ্টা করে একসময়।

বলে, কিন্তু—

তাকে বাধা দিয়ে কুন্তী বলে, যেটুকু বলেচি তার বেশী কিছুই আর এ মুহূর্তে বলতে পারছি না ভাই—ক্ষমা কর।

অনীতার সমস্ত মুখখানা সত্যি ততক্ষণে বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

কুন্তী মৃদু হেসে বলে, ভয় নেই ভাই—তোকে বিব্রত করবার জন্য আসি নি—একটা বা দুটো দিনের বেশী থাকব না। আর থাকা উচিতও হবে না—

অনীতার মুখে কোন কথা নেই।

কেমন করে যেন চেয়ে আছে অনীতা কুন্তীর মুখের দিকে।

কুন্তী তখন বলেছিল, মিথ্যা একটা বানিয়ে অনায়াসেই তোর

কাছে বলতে পারতাম অনীতা—কিন্তু তাতে করে না আমার, না আমার মেয়ের সম্মান বাড়বে—অথচ এই মুহূর্তে পুরোপুরি সত্যটাও যখন বলতে পারচি না তখন এইটুকু অন্তত জেনে রাখ যে মিথ্যা বলচি না—খুকী আমারই মেয়ে—কিন্তু আসল কথাটাই তোকে এখনো বলা হয় নি রে—

কি! সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় অনীতা কুন্তীর মুখের দিকে।

এম. এ. পাশ করেছি—বাড়ীতে জায়গা হ'ল না—ঠিক হ'ল না যে তাও নয় সবটা সত্যি, বিব্রত করতে চাই নি আমার জন্য কাউকে, তাই একটা চাকরির সন্ধানে বের হয়েছি—

চাকরি?

হ্যাঁ—

বলিস কি অত বড় একজন ধনী ডাক্তারের মেয়ে তুই। তোর চাকরি করতে হবে। তোরা তো মাত্র দুই বোন। ভাইও নেই—

তা নেই বটে তবু চাকরি করতে হবে—বিশেষ করে এই মেয়েটার জন্যই—

তোর বাবা তো বেঁচে নেই—

জানি না। বাবা অনেক দিন আগে সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছেন, তারপর আর কোন সংবাদই তার জানি না।

তবে সেদিন না বললেও পরে সবটা না হলেও কিছুটা সত্যি ঘটনা বলেছিল কুন্তী অনীতাকে।

অনীতা কেমন যেন সংশয়ভরা দৃষ্টিতে কুন্তীর মুখের দিকে চেয়ে ছিল সেদিন।

হঠাৎ মৃদু হেসে বলেছিল সে সময় কুন্তী, নিশ্চয়ই অনেক কথাই তোর মনে হচ্ছে না অনীতা—ভাবছিস ব্যক্তিটি কে—ব্যক্তিটি কিন্তু একেবারে রাস্তার ভিক্ষুক নয়—কমপিটেটিভ পরীক্ষা দিয়ে ভাল চাকরিও করছে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই—

মানে—

মানে তার মত হচ্ছে, বিয়েতে তার আর আপত্তি নেই কিন্তু ঐ খুকীকে বাদ দিয়ে। কি আব্দার বল তো, খুকী কি দোষ করল! তাই

খুকীকে নিয়ে আমি সরে এলাম—

বলিস কি—

তাছাড়া কি আর করতে পারতাম বল!

অত বড় একটা Scoundrel-কে অমনি অমনি ছেড়ে দিলি!

দিলাম, জোর করে কি কাউকে কেউ বেঁধে রাখতে পারে, না সে বাঁধন টেকে—

তারপর—

কি তারপর?

তোর মেয়ের পরিচয় কি হবে?

কেন, আমার পরিচয়ই হবে তার পরিচয়—

পাগল—মায়ের পরিচয়ে কোন সন্তান আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে কি পরিচিত হয়েছে?

তা এখন কি করব—পরিচয় যে দেবে না তার পায়ে গিয়ে মাথা খুঁড়তে হবে নাকি।

কিন্তু—

রক্ষে কর বাবা—কুন্তী চৌধুরী তার মধ্যে নেই—

অনীতা খুব খুশী না হতে পারলেও পরের দিন প্রভাস মিত্র এসে সব শুনে কিন্তু বললে, এই ত চাই—I appreciate your courage Miss Chaudhury—শুনুন—এখানকার মেয়ে স্কুলের সেক্রেটারীর সঙ্গে আমার বিশেষ জানা-শোনা ও হৃদ্যতা আছে, তাকে বলে দেখি আপনার একটা কোন ব্যবস্থা করা যায় কি না।

ভাগ্য ভাল কুন্তীর ছিল বলতেই হবে।. চাকরি একটা ছিল, এবং হয়ে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

শুধু একটু মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছিল কুন্তীকে সেদিন।

কুন্তী চৌধুরী নয় মিসেস কুন্তী সান্যাল নাম লেখাতে হয়েছিল তাকে।

কিন্তু সে মিথ্যা শেষ পর্যন্ত টিকল না।

কুৎসিত ভাবে একদিন সবকিছু প্রকাশ পেয়ে গেল—

পাঁচ বছর ধরে মিথ্যার আড়ালে থেকে সত্যটা প্রকাশ পেয়ে গেল হঠাৎ একদিন।

সেক্রেটারী বললেন এরপর আর তো আপনার এখানে স্থান হতে পারে না, মিসেস্ সান্যাল—

কুন্তী কোন জবাব দেয় নি—

মিটিং থেকে চলে এসেছিল এবং পরের দিন একটা রেজিগনেশন লেটার লিখে পাঠিয়ে দিল।

জান স্বর্ণেন্দু, তোমাকে সেদিন জানাইনি—এবং না জানিয়েই তোমার পদবীটা মাথায় তুলে নিয়ে সিঁথিতে দিয়েছিলাম সিন্দুর।

কিন্তু কি হ'ল—

এরা শেষ পর্যন্ত সেটা বিশ্বাস করল না—পাঁচ বছর বাদে স্পষ্ট জানিয়ে দিল সেটা মিথ্যা—অবিশ্যি জানতাম তোমাকে ডাকলে তুমি নিশ্চয়ই আমার পাশে এসে আজ দাঁড়াতে—সীতার পিতৃত্বকে সস্নেহে স্বীকৃতি দিতে কিন্তু তুমিই বল—তাই কি আমি পারি।

ছিঃ—

রাত শেষ হয়ে এল নাকি—

টেবিল ছেড়ে উঠে গিয়ে জানালাটা খুলে দিল কুন্তী।

না, এখনো অন্ধকার আকাশের গায়ে লেপটা আছে। সপ্তর্ষি আকাশে জ্বলজ্বল করছে।

ফিরে এল আবার টেবিলের সামনে কুন্তী।

ঘড়িতে সোয়া তিনটে।

ট্রাঙ্ক ও সুটকেসটা গোছানই আছে কেবল বেঁধে নিতে হবে বিছানাটা। তাও কুন্তী কারো সাহায্য না নিয়েই বেঁধে নিতে পারবে।

একা হলে কথা ছিল না কিন্তু সীতার বিছানাটা বেঁধে ফেললে ঘুমোতো কি করে।

সাঈদা অবিশ্যি বলেছিল, একটা রাত কুন্তীদি, তুমি তো আমার

ঘরে গিয়েও থাকতে পার, চল না—

সাঈদার কোয়ার্টারে গিয়ে যে শেষ রাতটা কাটাতে পারত না কুন্তী তা নয় কিন্তু মিথ্যে বিব্রত করতে চায় নি ও বেচারীকে।

বলেছে, কিছু দরকার নেই ভাই—কয়েকটা ঘণ্টা আর মাত্র তো।

। তিন ।

স্কুলের আটদশজন টীচার—তাদের মধ্যে একমাত্র ঐ সাঈদাই মুসলমান—এবং সেই কেবল তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় নি।

একমাত্র সেই তার কলঙ্ক নিয়ে হাসাহাসি করে নি বা কোন বক্রোক্তি করে নি। বরং তার পক্ষ নিয়ে অন্য সকলকে কড়া কড়া কথা বলেছে।

এবং তার ফলে সাঈদার প্রতি কম বক্রোক্তি বর্ষিত হয় নি।

কুন্তী আবার সীতার সামনে এসে দাঁড়াল।

নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে।

পাঁচ বছর বয়সের আন্দাজে একটু যেন বড়-সড়ই দেখায় ওকে।

আশ্চর্য !

ঐ শিশুর মধ্যেও মানুষ পাপ দেখে।

কোন ভয় নেই তোর সীতা, তোকে আমি বাঁচিয়ে তুলবই—মানুষের পরিচয় দেবই, মানুষ—পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে একদিন স্বীকার করতে হবে তোকে।

স্বীকার করতেই হবে মানুষের জন্মের মধ্যে কোন কলঙ্ক থাকে না। কোন পাপ মানুষের জন্মকে স্পর্শ করতে পারে না।

এ কেবল তোর অগ্নিপরীক্ষা সীতা—একদিন তোর অগ্নিশুদ্ধি হবেই।

তুই নির্মল, তুই নিষ্পাপ একথা তোকে প্রমাণ করতেই হবে। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একদিন তোকে হতেই হবে।

আবার টেবিলের সামনে ফিরে এসে কলমটা তুলে নিল কুন্তী।

চিঠিটা শেষ করতে হবে।

আজ আবার এখানকার আমার পাঁচ বছরের বাসা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে জানতে পারলাম আমরাই আমাদের অর্থাৎ নারীই নারীর সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু।

আমার কলঙ্কে নাকি তাদেরই সর্বাপেক্ষা বড় লজ্জা—তাদেরই সব চাইতে বেশি দুঃখ—তাই নাকি তারা আমাকে ক্ষমা করতে পারল না।

অবিশ্যি সেজন্য আমার কোন দুঃখ নেই—কিন্তু ওরা বুঝল না। আজ আমাকে সকলে মিলে ওরা হেয় প্রতিপন্ন করে, আমার গায়ে কাদা ছিটিয়ে দিয়ে—নিজেদের গায়ে তো কাদা মাখলই—সমস্ত নারী জাতটার গায়েও মেখে দিল।

অথচ দেখ কি আশ্চর্য—ওদের কাছেই আমার সব চাইতে বড় দাবি ছিল, আমাকে বিচার করতে গিয়ে ওরা একবারও ভাবল না ওদের যে কারোরই সন্তান হতে পারত সীতা, সীতার জন্মবৃত্তান্তর মধ্যে অস্বাভাবিক—অত্যাশ্চর্য কিছু নেই—

প্রতিনিয়ত পৃথিবীর ঘরে ঘরে মানুষের যে জন্ম-ইতিহাস রচিত হচ্ছে সীতা তার ব্যতিক্রম নয়।

এবং সীতা যেদিন মাথা তুলে দাঁড়াবার পর ওদের আজকের এই কথা শুনবে সেদিন কি ওদের কাউকে ও ক্ষমা করতে পারবে!

তবু—তবু—যাবার আগে সান্ত্বনা রইল আমার সাঈদা—ঐ ভিন্নজাতের, ভিন্নধর্মের মেয়েটি।

ওদের সকলের নীচতা, কুশ্রীতা ও অবক্ষয়ের মধ্যে বিদুরের এক মুঠো ক্ষুদের মতই তার প্রীতি ও সমবেদনাটুকু অন্তত মুঠো ভরে নিয়ে যাচ্ছি সেও তো কম নয়।

এই চিঠির পর আবার কবে তোমাকে চিঠি দিতে পারব জানি না। কারণ সেদিন এমনি এক রাত্রে যখন দু'মাসের সীতাকে বুকে জাপটে ধরে ঘরের বাইরে যে অনিশ্চয়তার মধ্যে পা বাড়িয়েছিলাম আজও আবার সেই অনিশ্চয়তার মধ্যেই পা বাড়াচ্ছি।

কিছু দিন চিঠি না পেলে কিন্তু চিন্তিত হয়ো না।

জানি আজও তোমার মত বদলায় নি, আজও তুমি বলবে, তোমার ওখানে কেন চলে গেলাম না—কিন্তু কোন দিন ইতিপূর্বে তোমার সে প্রশ্নের জবাব দিই নি—আজ দিচ্ছি।

শুধু বলেছি এতদিন, ছিঃ—

কিন্তু সেটাই তো সব কথা নয়।

জানি স্বর্ণেন্দু, জানি সীতাকে তুমি অপমান করবে না। তোমার দিক থেকে সে সম্ভাবনা কোন দিনই নেই এবং সেটা স্বপ্নেরও অগোচর কিন্তু আমার দিক বলেও তো একটা বস্তু আছে।

তাই আর যাই করি না কেন মানুষের সমস্ত কিছু নীতি ও সৌজন্য-বোধের যে একটা স্বাভাবিক সীমারেখা আছে, সেটা লঙ্ঘন করবারও যে একটা নীতি আছে—তা কেমন করে না মেনে পারি তুমিই বল।

তা ছাড়া দায়িত্ব তুমিই বা নেবে কেন যেমন কথাটা অত্যুক্তি নয়, তেমনি তোমার যে সন্তান আমার গর্ভে আসবে তাদের প্রতিও তো আমার সব কিছু বাদ দিলেও একটা কর্তব্য থাকে—তখন সেই কর্তব্যের যদি ক্রটি ঘটে তখন নিজেকেই বা আমি নিজে ক্ষমা করব কি করে বলতে পার ?

অথচ সীতা আমার যেমন প্রিয় তুমিও আমার তেমনি প্রিয়।

কিন্তু আর না—যাবার সময় হল—

আজকের মত এইখানেই ইতি করলাম।

তোমার কুন্তী।

বন্ধ দরজার উপর করাঘাত শোনা গেল একটু পরেই।

কুন্তীর খামের মধ্যে চিঠিটা ভরে সবে ঠিকানাটা লেখা তখন শেষ করেছে।

কে ?—কুন্তী শুধায়।

আমি, কুন্তীদি—দরজাটা খোল—

সাঈদার গলা।

ও বলেছিল, রাত চারটেয় তো বেরুবে—তার আগে আমি আসব—

কুন্তী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল। সাঈদা এসে ঘরে প্রবেশ করল।

হাতে ওর একটা কেৎলি—বোধহয় চা এনেছে, হাতে দুটো কাপ আর একটা কাগজের মোড়ক।

কেৎলিতে আবার কি আনলি?

একটু চা—

সত্যি, তোকে নিয়ে আর পারি না সাঈদা। এমন করে যাবার আগে বাঁধছিস কেন বল তো—

হয়েছে—হাত মুখ ধুয়ে নাও। চা-টা গরম গরম থাকতে খেয়ে নাও।

প্যাকেটে আবার কি?—জিজ্ঞেস করে কুন্তী।

ও কিছু না, এত সকালে বেরুচ্ছ—বাচ্চাটা রয়েছে সঙ্গে, পথে খিদে পেলে কোথায় কি পাবে না পাবে—তাই একটা প্যাকেট বিস্কুট দিয়ে দিচ্ছি।

বেশ, রাখ। তোকে না বলবার ক্ষমতাই বা কোথায় আমার সাঈদা।

কি যে বল, তুচ্ছ এক প্যাকেট বিস্কুট।

শুধু তো ঐ বিস্কুটের প্যাকেটটাই নয় ভাই—তোর কাছে যে ঋণ রেখে গেলাম এ জীবনে তাই কোনদিন কি শোধ করতে পারব—

ছিঃ ছিঃ কুন্তীদি, ওকথা বলো না। আমি তোমার জন্য কি করেছি যে ও কথা তুমি বলছ? বরং এই দুঃখটাই চিরকাল আমার থাকবে। আমরা মেয়েরাই তোমাকে এত বড় অপমান করে দল বেঁধে এখান থেকে তাড়িয়ে দিলাম। যাক্ ওসব কথা, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, মুখ ধুয়ে এসে চা-টা খেয়ে নাও—

পাশের বাথরুমে গিয়ে কোনমতে হাত-মুখটা ঠাণ্ডা বরফ গলানো জলেই ধুয়ে এল কুন্তী—

বাথরুমের পাশেই ছোট রান্নাঘরটা।

রান্নাঘরে সব জিনিস রয়ে গেল। এই কয় বছরে এক একটি করে

সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক খুঁটিনাটিই ক্রয় করেছিল।

সব কিছুই সে রেখে যাচ্ছে। সাঙ্গদা বার বার বলেছিল, সব ফেলে রেখে যাচ্ছ, আবার তো দরকার হবে—

না—দরকার যখন হবে তখন দেখা যাবে কিন্তু এখানকার কোন চিহ্নই সঙ্গে নেব না। মানুর মা দেশে গেছে, সে ফিরে এলে ওসব তাকেই দিয়ে দিস্—

কিন্তু—

না রে যত বোঝা পথে কম হয় ততই ভাল।

সাঙ্গদা কুন্তীকে খুব ভাল করেই চেনে তাই তর্ক করে নি।

ঘরে এসে ঢুকতেই চায়ের কাপটা এগিয়ে দেয় সাঙ্গদা।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কুন্তী বলে, ঐখানে কাগজের ঐ খামটায় মানুর মার দু'মাসের মাইনে রেখে গেলাম, এলে তাকে দিস্।

কলকাতায়ই তো যাচ্ছ কিন্তু কলকাতায় কোথায় উঠবে কিছু ঠিক করেছ? সাঙ্গদা প্রশ্ন করে।

না—

তবে?

দেখি একটা আশ্রয় যতদিন না মেলে কোন একটা হোটেলে উঠব—

তোমাকে একটা কথা কাল জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলাম কুন্তীদি?

কি সাঙ্গদা?

শিশিরাংশু সেন বলে কাউকে তুমি চেন?

হঠাৎ যেন ভুত দেখার মতই চমকে ওঠে নিজের অজ্ঞাতে কুন্তী—সাঙ্গদার মুখের দিকে তাকায়।

অর্ধোস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কি ; কি নাম বললি?

শিশিরাংশু সেন—চেন নাকি?

কুন্তী ততক্ষণে নিজের আকস্মিক চমকটা সামলে নিয়েছে। বলে, কেন—কেন বল তো?

কাল রাত্রে তোমার এখান থেকে ফিরে যেতে মিষ্টার চপলাদির

সঙ্গে তোমার কথা নিয়ে আলোচনা হতে হতে হঠাৎ উত্তেজনার মধ্যে তিনি বলেছিলেন—

কি, কি বলছিলেন ?

কমিটি শিশিরাংশু সেনের একটা চিঠি পেয়েই নাকি—

শিশিরাংশু সেনের চিঠি !

হ্যাঁ—

সে—সে কি লিখেছে চিঠিতে—

তা তো ঠিক জানি না—বলেনও নি সব খুলে তবে এইটুকু বলেছিলেন, তাঁর চিঠি পাবার পরই স্কুল কমিটি তোমার সম্পর্কে অনুসন্ধান করে—

কিছু বলেন নি চপলাদি চিঠিটা সম্পর্কে ? না তুই আমার কাছে গোপন করছিস সাঈদা ?

গোপন করব কেন, বলেন নি উনি—আর আমারও সত্যি কথা বলতে কি ঐ নোংরা ব্যাপারে মাথা গলাতে প্রবৃত্তি হয় নি। তবে একটু যা বলেছেন তা হচ্ছে—তিনিই নাকি জানিয়েছেন ঐ খুকী তোমার অবৈধ সন্তান।

বাইরে থেকে ঠিক ঐ সময় সাইকেল-রিক্‌শাওয়ালার গলার স্বর শোনা গেল, মাঈজী, এখন না বেরুলে ট্রেন ধরতে পারব না।

কুন্তী তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, আমি তৈরী রে—এক্ষুনি বের হয়ে পড়ব।

কুন্তী এগিয়ে গেল শয্যার কাছে।

ঘুমন্ত মেয়ের কপালে গভীর স্নেহে হাত দিয়ে মৃদুকণ্ঠে ডাকে, সীতা, সীতা ওঠ মা—

সীতা ঘুম ভেঙে উঠে বসে।

মামণি—

ওঠ, এবারে আমাদের যেতে হবে যে—

ট্রেনে চেপে আমরা যাব, তাই না মামণি ?

হ্যাঁ, ওঠ—

কুন্তী সীতার হাত-মুখ ধুইয়ে জামাকাপড় পরিয়ে সাঈদার সাহায্যেই বিছানাটা চটপট বেঁধে নেয়।

সাঈদা রিক্‌শাওয়ালাকে ডাকে—সে ভিতরে আসতে বলে, এগুলো নিয়ে যা—

রিক্‌শাওয়ালা মালপত্র একে একে নিয়ে সাইকেল-রিক্‌শায় তুলল।

শূন্য ঘরটার দিকে একবার তাকাল কুন্তী।

পাঁচ বছর এই ঘরে তার কেটেছে।

পাঁচ বছরের স্মৃতি তো কম নয়। অনেক দিন, অনেক রাত্রি—অনেক মুহূর্তের ইতিহাস।

সেই ইতিহাসের স্মৃতি।

পাঁচ বছরের প্রাত্যহিকতার মধ্যে যেন ভুলেই গিয়েছিল কুন্তী—এই কোয়ার্টার আবার কোন একদিন তাকে এমনি এক রাত্রিশেষে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে ছেড়ে চলে যেতে হবে।

ভাবতে পারে নি পাঁচ বছর পরে এমনি করে এক প্রত্যুষে বাইরে আবার পা বাড়াতে হবে—অনিশ্চয়তার মধ্যে।

আশ্চর্য। সব কিছুর মূলে নাকি শিশিরাংশু।

তা হলে ব্যাপারটা শিশিরাংশুরই কীর্তি।

চল—

সাঈদার কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে আবার কুন্তী। বলে, হ্যাঁ—চল।

সীতার হাত ধরে কুন্তী বাইরে বের হয়ে এল।

রিক্‌শায় উঠে বসল—রিক্‌শাটা চলতে লাগল।

পিছন ফিরে তাকাল কুন্তী, সাঈদা ঠিক তেমনি করে সামনের বারান্দায় আবছা রাত্রিশেষের আলোছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্রমে ক্রমে সাঈদার ঝাপসা চেহারাটা মিলিয়ে গেল, হারিয়ে গেল।

সমস্ত শহর এখনো নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমের মধ্যে তলিয়ে আছে।

কনকনে শীতের হাওয়া চোখে-মুখে যেন ছুঁচ বেঁধায়।

। চার ।

রাত্রিশেষের তরল অন্ধকারের মধ্যে ট্রেনটা হু হু করে ছুটে চলেছে।

একটা প্রায়-খালি সেকেণ্ড ক্লাশ লেডিস কম্পার্টমেণ্টই পেয়ে গিয়েছিল কুন্তী, সীতাকে শুইয়ে দিয়েছে বার্থটায়—সীতা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

শিশিরাংশু।

তা হলে শিশিরাংশুই শত্রুতা করেছে। কিন্তু কেন?

পৃথিবীতে যা কেউ কোনদিন করত না—করতে পারে না, তাই তো সে করেছে শিশিরাংশুর জন্য।

কিন্তু সত্যিই কি শিশিরাংশুর জন্য—

না তো—সে যা কিছু করেছে মানসীর জন্য—

সীতা যেমন আজ তার সন্তান হয়ে তাকে আঁকড়ে ধরেছে, মানসীও যে ঠিক তেমনি করেই তাকে দু'হাতে আঁকড়ে ছিল।

মা বেঁচে থাকলেও মানসী যে তারই কোলে-পিঠে মানুষ হয়েছে।

পক্ষাঘাতে পঙ্গু মা তখন তো এক প্রকার মৃত বললেও চলে।

তার নিজের তখন মাত্র বার বছর বয়স—সে নিজেই বালিকা—তবু তাকেই নিতে হয়েছিল সেদিন মানসীর সকল ভার—সকল দায়িত্ব।

দিদি বলে ডাকলেও একদিক থেকে মানসীর মা কি সেই ছিল না।

আর তাই না, সত্যিকারের মায়ের প্রতি তার কোনদিন এতটুকু আকর্ষণ বা শ্রদ্ধা জাগে নি। অনুভবও করে নি সে।

এমন কি মা যেদিন মারা গেল মানসীও তখন নেহাৎ ছোটটি নয়, বছর ষোল বয়স। দীর্ঘকাল পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়িনী থেকে মা মারা গেলেন অথচ মানসী সেদিন এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলে নি। বরং সেজেগুজে সিনেমা দেখতে চলে গিয়েছিল পালিয়ে।

রাত্রে শ্মশান থেকে ফিরে এসে মানসীকে বলেছিল ও, ছিঃ মানসী, মাকে শ্মশানে নিয়ে গেলাম আমরা আর তুই গেলি সিনেমায় পালিয়ে?

বিছানার উপর শুয়ে একটা উপন্যাস পড়ছিল মানসী।

বলে, মা তাতে হয়েছে কি—তুমিই তো ছিলে—

কিন্তু আমার একার তো মা নয়—

তোমারই মা, আমার কেউ নয়। তাছাড়া শিশিরাংশুদা বললে—ফোনে অমন করে—

কে, কে বললে—

শিশিরাংশুদা—

শিশিরাংশু ফিরেছে নাকি মুর্শিদাবাদ থেকে—

সে তো পরশুই ফিরেছে—

কিন্তু কই, আমার সঙ্গে তো দেখা করে নি!

হয় তো সময় পায়নি—মানসী বলে।

সেই দিন—সেই দিনই রাত্রে শুয়ে প্রথম মনে হয়েছিল কুন্তীর কথাটা।

শিশিরাংশু—শিশিরাংশু কলকাতায় এসেও তার সঙ্গে দেখা করে নি।

এবং তাকে না জানিয়ে ফোনে মানসীকে ডেকে নিয়ে সিনেমায় গিয়েছে।

শিশিরাংশু আর স্বর্ণেন্দু।

তাদের সঙ্গে কি তার আজকের পরিচয়!

অনেক বছরের পরিচয়।

কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা—শিশিরাংশুর সঙ্গে তার সম্পর্কটা—সেটা আর যার কাছেই অস্পষ্ট থাক তাদের নিজেদের কাছে তো অস্পষ্ট নেই।

তবে—তবে এ ধরনের ব্যবহার করার শিশিরাংশুর মানেটা কি?

সেই দিন—সেই দিনই প্রথম বিশ্লেষণ করেছিল মনে মনে একক শয্যায় শুয়ে শুয়ে অন্ধকারে শিশিরাংশুর ইদানীংকার ব্যবহারের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে।

বছরখানেক থেকেই যেন শিশিরাংশুর মধ্যে কেমন একটা পরিবর্তন এসেছে—

তার ব্যবহারে, তার কথাবার্তায় যেন আর সে উত্তাপ নেই।

এবং শুধু ঐ দিনই তো নয়—মানসীকে একা একা নিয়ে আরো কয়েকদিন শিশিরাংশু বেড়াতে গিয়েছে, সিনেমায় গিয়েছে।

অথচ কথাটা তাকে জানানও প্রয়োজন মনে করে নি।

কেন মনে করে নি—কেন?

তবে কি মানসীকে শিশিরাংশু—আর ভাবতে পারে নি—কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গিয়েছে।

তবু, তবু পরদিন প্রত্যুষে শয্যা থেকে উঠে মনে মনে বলেছে কি পাগলের মত আবোল-তাবোল গতরাত্রে সব সে ভেবেছে।

শিশিরাংশু মানসীকে—ছিঃ ছিঃ—

কেমন করে ভাবতে পারল সে কথাটা।

বাবা সতীনাথ দীর্ঘ দিন ধরেই সংসার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে স্ত্রী নর্মদার পক্ষাঘাতে অসুস্থ হবার পর থেকেই।

কলকাতা শহরে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক হিসাবে—অমন রোরিং প্র্যাকটিস্ হঠাৎ বন্ধ করে দিলেন ডাঃ সতীনাথ চৌধুরী।

বললেন, মিথ্যা—ওর কোন মানে হয় না—We doctors are helpless in the hands of destiny—কিছু আমরা করতে পারি না—কিছু করতে পারি না আমরা—

চিকিৎসক বন্ধু-বান্ধবেরা বলেছিল, এ তুমি কি বলছ সতীনাথ—

ঠিকই বলেছি—তোমরা তো এতগুলো বিলেত-ফেরত বড় বড় অভিজ্ঞ ডাক্তার ছিলে—নর্মদার কিছু করতে পারলে তোমরা—

কিন্তু তোমার স্ত্রীর যে রোগ হয়েছে তাতে আর কি করবার আছে তুমিই বল?

সেই কথাটাই তো আমি বোঝাতে চাইছি তোমাদের, কিছু করবার নেই যখন তখন কেন আর এ মিথ্যা প্রহসনের জের টানা—

এই কি একটা তোমার যুক্তি হল সতীনাথ ?

যুক্তি কি না জানি না তবে একথাটা আজ তোমরা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না—আজকের দিনে আমরা এতগুলো এত বড় বড় ডাক্তার ও তোমাদের এত সব আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি ও ঔষধপত্র থাকা সত্ত্বেও নর্মদা আমাদের চোখের সামনে পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকবে যতদিন না সত্যি সত্যি মৃত্যু এসে তাকে এই যন্ত্রণা আর প্রতিমুহূর্তের মৃত্যু থেকে মুক্তি দেয়।

বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাপের কথাগুলো শুনছিল কুন্তী।

ডাঃ মুখার্জী সতীনাথের দীর্ঘদিনের সুহৃদ এবং ঐ বাড়িতে তাঁর খুব বেশী যাতায়াতই ছিল—তিনি বের হয়ে আসতেই ঘর থেকে কুন্তীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়।

কুন্তীই ডাকে, কাকাবাবু—

ডাঃ মুখার্জী কুন্তীর মুখের দিকে তাকালেন, ও বোধ হয় আর সত্যিই ফিরবে না মা—

তা হলে কি হবে কাকাবাবু, বাবা যে এক মুহূর্তও ঐ ডাক্তারী, রোগী, হাসপাতাল, চেম্বার ছাড়া থাকতে পারেন না—

সেইটাই তো সবচাইতে বড় আশ্চর্য লাগছে মা—কি জান মা, একটু থেমে ডাঃ মুখার্জী বলেন, একটা প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল ওর এই Medical Scienceটার উপরে—শুধু বিশ্বাস নয়, আস্থাও ছিল গভীর—আর ঠিক সেইখানেই আঘাতটা লেগেছে—এটা তারই একটা প্রতিক্রিয়া।

কাকাবাবু—

হ্যাঁ মা, তোমার যেখানে ভয়—আমারও ভয়টা সেখানেই। ও নিজেকে যদি এই আশাভঙ্গের বিপর্যয় থেকে না উদ্ধার করতে পারে তাহলে ও হয়ত পাগল হয়ে যাবে।

পাগল অবিশ্যি হন নি সতীনাথ কিন্তু পাগল না হলেও সংসার থেকে নিজেকে যেন একবারে নিশ্চিহ্ন করে মুছে নিয়েছিলেন।

এবং মুছে নিলেন নিজেকে একেবারে সংসার থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে।

বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে পড়লেন একদিন।

বেরুবার আগের দিন রাত্রে, কুন্তীকে ডেকে পাঠালেন নিজের ঘরে।

কুন্তী এসে ঢুকল ঘরে, আমাকে ডাকছিলেন বাবা?

হ্যাঁ মা—কাল ভোরে আমি বের হয়ে যাচ্ছি—

কোথায় বাবা?

তা জানি না মা—তবে বের হয়ে যাচ্ছি—

কুন্তী নিঃশব্দে বাপের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সতীনাথ বলেন, ব্যাঙ্কে ইনস্ট্রাকসন দিয়ে দিয়েছি—তুমি তোমার নামেই চেকে টাকা ড্র করতে পারবে—এ বাড়িটা রইল আর ব্যাঙ্কে যা রইল—তোমাদের মা যতদিন বেঁচে থাকবেন ও তোমাদের দু'বোনের তাতে কোন কষ্ট হবে না, যদি অবিশ্যি দু'হাতে সব না উড়িয়ে দাও।

বাবা—

বল মা?

আবার কবে আপনি আসবেন?

তুমি আমার মেয়ে হলেও তুমি আমার ছেলের অধিক মা—শুধু যে সেটা আমার ভাবা তাই নয় বিশ্বাস করি সেটা পুরোপুরি, তাই তো আজ এত বড় একটা দায়িত্ব তোমার ঘাড়ের উপর ফেলে দিয়ে বের হয়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি—

বাবা—

শোন মা, অনেকে হয়ত আমার সম্পর্কে অনেক কথা বলবে, ভীরু—কাপুরুষ—অপদার্থ—কিন্তু মা, তোমার কাছ থেকে যাবার আগে আমি সত্য কথাটাই বলে যাচ্ছি, তোমার মার ঐ অসহায় অবস্থাটা যখনই চোখে পড়ে তখনই তোমার মার অনেকদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ে, তোমার মা বলতেন আমি নাকি মস্ত-বড় ডাক্তার—তাই

তাঁর স্থির বিশ্বাস একটা বরাবর ছিল, তার যত কঠিন অসুখই হোক না কেন আমি ঠিক তাকে ভাল করে তুলতে পারবই। আজ তোমার মার চোখের দিকে চাইলে মনে হয় যেন সেই কথাটাই তার চোখ বলছে, তুমি আমাকে ভাল করে, আবার সুস্থ করে তুলছ না কেন? কেন—কেন—

একটু থেমে আবার সতীনাথ বলেন, আজ যদি তাঁর কথা না বন্ধ হয়ে যেত, যদি কথাটা বলতে পারতেন আমি অন্তত চিৎকার করে প্রতিবাদ জানিয়ে আজ তাঁর সত্যিকারের কথাটা জেনে নিতে পারতাম কিন্তু তারও উপায় নেই—এ পীড়ন—এ অসহ্য—দিবারাত্র আর আমি সহ্য করতে পারছি না—আমাকে যেন নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করছে—আমাকে যেন পাগল করে তুলছে—

কিন্তু বাবা—মাকে তো আপনি ভাল করবার কম চেষ্টা করেন নি—চিকিৎসার দ্বারা যা সম্ভব—মা মুখে সেটা প্রকাশ না করতে পারলেও চোখে কি সেটা দেখেন নি, মনে মনে কি বোঝেন নি—কথাই বলতে পারেন না, জ্ঞান তো পুরোপুরিই আছে মার—

আমার লজ্জা, আমার দুঃখ তো মা সেইখানেই—পঙ্গু থেকেও যদি ওর মুখে অন্তত কথাটা ফোটাতে পারতাম—

সেই দিন—সেই দিন প্রথম ও শেষ কুন্তী সতীনাথের চোখে জল দেখেছিল।

দু'ফোঁটা চোখের জল গাল বেয়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়তে দেখেছিল ও। আর তাইতেই ও বুঝেছিল কত বড় দুঃখে অমন মানুষটার চোখ দিয়ে জল বের হয়ে এসেছে।

আর সে কোন কথা বলতে পারে নি।

সতীনাথ বলেছিলেন, তোমাদের মা যে আমার কতখানি ছিল, সন্তান তোমরা, তোমাদের কাছে প্রকাশ করতেও পারব না—আর প্রকাশ করলেও হয়ত ঠিক সেটা বুঝবে না। আজ আমার কাছে আমার এত বছরের উদ্যম, কর্মপ্রচেষ্টা, সাফল্য সব ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। সব মনে হচ্ছে মিথ্যা, তাই শুধু এই মিথ্যা, এই লজ্জা থেকে সরে যাচ্ছি দূরে।

কিন্তু বাবা, একটা পরামর্শ দেবার মতও তো কেউ আমাদের আশেপাশে রইল না—

কারো পরামর্শ নিও না মা—তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে—ভুল হবে এবং ভুল হয়ই, তার জন্য দুঃখ করো না।

আপনি কি আজই চলে যাবেন?

হ্যাঁ, আজই—

কখন?

শেষ রাত্রের দিকে—

মানসীকে ডাকব বাবা?

না—থাক—তোমার মা এখন জেগে আছেন?

একটু আগে দেখে এসেছিলাম জেগেই আছেন—দেখে আসব—

এস—

॥ পাঁচ ॥

নর্মদা জেগেই ছিল।

ডান হাত—ডান পাটা পঙ্গু, অসাড়, সেই সঙ্গে বাক্‌-শক্তিও অন্তর্হিত।

ফ্যাল ফ্যাল করে কেবল চেয়ে থাকে আর মধ্যে মধ্যে চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, মাসখানেক আগে থাকতেই সতীনাথ স্ত্রীর ঘরে আসা ছেড়ে দিয়েছিলেন—মনে মনে তখন বোধ হয় তার প্রস্তুতি চলেছে।

কুন্তীর অন্তত তাই মনে হয়েছিল পরে।

আর মনে হয়েছিল ভালবাসার এমন দৃষ্টান্ত বুঝি সত্যিই বিরল।

সতীনাথ যখন ঘরে গিয়ে ঢোকেন—নর্মদা তখন চোখ বুজে ছিল—ও পাশের জানালার আধ-ভেজানো কপাটের আড়াল থেকে দেখেছিল সে দৃশ্য কুন্তী।

আশ্চর্য !

সতীনাথ ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই নর্মদা চোখ মেলে তাকাল। এবং অন্য দিকে মাথাটা ছিল, এবারে মাথাটা ঘুরিয়ে তাকাল সতীনাথের দিকেই।

সতীনাথ মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন নর্মদাকে সহসা তার দিকে ঘুরে তাকাতে দেখে।

কথা বলতে পারছে না নর্মদা—শুধু চেয়ে আছে চোখ দুটি মেলে।

সে কি দৃষ্টি !

যেন অফুরন্ত স্নেহ—মমতা—ও ভালবাসা সেই দৃষ্টির মধ্যে।

সতীনাথ ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে শয্যাপাশে দাঁড়ালেন।

ডান হাতটা তুলে নর্মদার শীর্ণ কপালের ওপরে রাখতেই নর্মদা বাঁ হাত দিয়ে স্বামীর হাতটা চেপে ধরে চোখ বুজল।

বোজা চোখের কোল বেয়ে ক্ষীণ দুটি অশ্রুর ধারা নেমে এসে শীর্ণ গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

কতক্ষণ অমনি করে রইল দুজনে।

সতীনাথ শিয়রের সামনে দাঁড়িয়ে আর নর্মদা তার বাঁ হাতটা দিয়ে সতীনাথের ডান হাতটি ধরে আছে।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বোধ করি কুন্তীরই সেদিন পা ধরে গিয়েছিল।

অনেকক্ষণ পরে সতীনাথ ধীরে ধীরে স্ত্রীর মুঠি থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন।

নর্মদার চোখ দুটি তখন বোজা।

ঘুমচ্ছিল কি না কে জানে।

সেই দিনই রাত্রিশেষে কখন এক সময় সতীনাথ গৃহ ছেড়ে চলে গিয়েছেন কুন্তী জানতেও পারে নি।

কিছুতেই ঘুমাবে না—জেগে থাকবে মনে মনে স্থির করেছিল কিন্তু পারে নি—শেষ রাত্রের দিকে কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল কি একটা ভারী বস্তু মেঝেতে পতনের ঝন্ ঝন্ শব্দে।

পাশের ঘরে মা থাকে—পাশের ঘর থেকেই শব্দটা এসেছিল—যদিও একজন নার্স সর্বক্ষণ রাত্রে ও একজন সর্বক্ষণ দিনের বেলাতে থাকে নর্মদাকে দেখাশোনা ও পরিচর্যা করবার জন্য, তবু শব্দটা শুনে ঘুম ভেঙে ছুটে যায় কুন্তী পাশের ঘরে।

কুন্তীর পদশব্দে রাত্রে নার্স ওর দিকে ফিরে তাকাল, সে তখন মেঝে থেকে ভাঙা ফিডিং কাপের টুকরোগুলো একটা একটা করে কুড়োচ্ছে।

সে বলে, দেখুন না—হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপর থেকে ফিডিং কাপটা ফেলে দিয়ে ভাঙলেন আপনার মা—

কুন্তী মার দিকে তাকাল।

তার মনে হয় ঐ মুহূর্তে নর্মদার চোখ দুটো যেন কি বলতে চাইছে।

কি হয়েছে মা ?

নর্মদার ঠোঁট কাঁপতে থাকে মৃদু মৃদু। কুন্তী বুঝতে পারে মা কি যেন বলবার তাকে চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না।

মা—

কুন্তী মার হাতটা ধরে—হাতটা তখন নর্মদার কাঁপছে।

কুন্তী ভয় পেয়ে যায়—তাড়াতাড়ি বারান্দায় ছুটে গিয়ে ডাঃ মুখার্জীকে ফোন করে ফিরে আসবার সময় সতীনাথের ঘরের দরজাটার দিকে তার নজর পড়ে।

দরজাটা হা হা করছে খোলা—ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে।

কি ভেবে কুন্তী ঘরের ভিতর গিয়ে পা দেয় এবং পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়িয়ে যায়, সতীনাথ নেই ঘরে।

ধক্ করে ওঠে যেন বুকের ভিতরটা, বাবা—বাবা—

কারো কোন সাড়া নেই।

শুধু রাত্রিশেষের হাওয়ায় ঘরের জানালার পর্দাগুলো উড়ছে। সামনেই দেওয়ালে টাঙানো মা ও বাবার পাশাপাশি এনলার্জ ফটো দুটো।

সেই ফটোর দিকে নজর পড়ল।

সতীনাথ যেন চেয়ে আছেন তার মুখের দিকে।

আধঘণ্টার মধ্যেই ডাক্তার মুখার্জী এলেন।

রোগিণীকে পরীক্ষা করে বললেন, কোন কারণে খানিকটা excitement হয়েছিল বোধ হয়—Pulse rate ও Pressureটা একটু বেড়েছে—otherwise ভয়ের কোন কারণ নেই—

একটা ঘুমের ঔষধ দিয়ে চলে গেলেন ডাঃ মুখার্জী।

পরে কুন্তীর মনে হয়েছে—তবে কি মা সেই মুহূর্তে বাবার চলে যাওয়ার ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল?

কারণ ইতিপূর্বে যেমন কখনো ওরকম হয় নি, তেমনি পরে যতদিন বেঁচে ছিল নর্মদা ওরকম কিছু কোনোদিন হয় নি।

এদিকে—পরের দিন থেকেই সংসারের সমস্ত দায়িত্বটা এসে পড়ল কুন্তীর ঘাড়ের উপরে।

কতই বা বয়স তখন কুন্তীর।

তার উনিশ আর মানসীর বার, সে তখন থার্ড ইয়ারে আর মানসী পড়ে ক্লাস এইটে—স্কুলে।

সতীনাথের চলে যাওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু বেশী দিন চাপা গেল না। ক্রমে ক্রমে বাড়ির সবাই জেনে ফেলল। কিন্তু সংসারের চাকাটা অব্যাহত চলতে লাগল।

বাড়ির একটিমাত্র মানুষ চলে যাওয়া ছাড়া আর কোন পরিবর্তনই তো হয় নি।

সব ব্যবস্থা যে করে রেখে গিয়েছিলেন সতীনাথ।

বিরাট বাড়ি—গাড়ি—চাকর-চাকরাণী-আয়া—ড্রাইভার—ঠাকুর আর ছিল সরকার—বনমালী সরকার।

দীর্ঘদিনের লোক ঐ বাড়িতে ঐ বনমালী সরকার।

জ্ঞান হওয়া অবধি কুন্তী বনমালী সরকারকে দেখে আসছে—ছোট বেলায় তো কত কোলে-পিঠেও চড়েছে।

রোগা ঢ্যাঙা দড়ির মত পাকানো চেহারাটা।

কষ্টিপাথরের মত কালো গায়ের রঙ।

মাথায় কাঁচা পাকা কদমছাঁট চুল—চোখে নিকেলের ফ্রেমের চশমা—বাঁকানো উঁচু নাক। তোবড়ানো গাল। মুখে সর্বদাই খোঁচা খোঁচা দাড়ি থাকত।

হপ্তায় একদিনের বেশী কামাত না বনমালী সরকার।

কি শীত, কি গ্রীষ্ম একটা গলাবন্ধ খদ্দরের মোটা কোট গায়ে—হাঁটুর ওপর তোলা মোটা খদ্দরের ধুতি।

বাবা ডাকত বনমালী বলে—মা ডাকত ঠাকুরপো—আর ওরা দুবোনে ডাকত বনমালী কাকা।

বাড়ির অন্যান্য সকলে বলত, সরকার মশাই—

বাড়ির একতলায় পশ্চিমের ছোট ঘরটিতে এক কোণে থাকত বনমালী সরকার।

ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রের কোন বাহুল্য ছিল না—

একটা চৌকি তার উপরে একটা সতরঞ্চি পাতা, একটা বালিশ। এক কোণে একটা টিনের পোর্টম্যান্টো আর একজোড়া ক্যামবিশের জুতো, তাও ধুলোয় ধুলোয় লালচে হয়ে গিয়েছে।

বড় হয়ে বাবার কাছে একদিন কথায় কথায় শুনেছিল কুন্তী, ব্রিটিশ আমলে লোকটা নাকি একজন দুর্ধর্ষ—terrorist—বিপ্লবী ছিল। ঘরছাড়া গৃহহারা—কোথায় কোথায় কোন পাহাড়ে, কন্দরে, ঘনবনের মধ্যে আত্মগোপন করে বেড়াত আর দেশকে সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা স্বাধীন করবার স্বপ্ন দেখত।

কতবার সশস্ত্র ব্রিটিশের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করেছে—

দেশ স্বাধীন হবার পর যখন ফিরে এল—দেখল তার কথা কেউ জানে না—জানার প্রয়োজনও মনে করে না।

তারপরেই কথাগুলো অবিশ্যি একদিন কুন্তীই জিজ্ঞাসা করে জেনেছিল।

কেন কাকা, চিনতে পারল না কেন তোমায়?

দূর পাগলী…কি এমন করেছি বল তো যে আমায় চিনে রাখতে হবে! দেশকে ভালবেসেছি সে একান্তই নিজস্ব আমার মনের তাগিদে। দেশ স্বাধীন হোক এইটাই চেয়েছিলাম—স্বাধীন দেশের একজন নাগরিক হব, হয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকব এইটুকুই চেয়েছিলাম—তার বেশী তো কিছু চাই নি—

কি বলতে গিয়েও যেন চেপে গিয়েছিল নিজেকে বনমালী সরকার।

এবং তারপর অনেকবার প্রশ্ন করেও কোন জবাব পায় নি বনমালীর কাছ থেকে কুন্তী।

যা হোক ঐ বনমালী সরকার মানুষটা নীচের একটি ছোট ঘরে সবার চোখের আড়ালে থাকলেও সে যে সতীনাথের সংসারের প্রাণকেন্দ্র ছিল সেটা বুঝতে কুন্তীর বেশীদিন দেরি হয় নি।

সতীনাথকে একদিন কুন্তীই প্রশ্ন করেছিল, আপনি বনমালী কাকাকে খুব বিশ্বাস করেন, না বাবা?

একটা কথা মনে রাখিস মা—অত বড় বিশ্বাসের জায়গা যেমন পাবে না, তেমনি অমন একজন সত্যিকারের শুভানুধ্যায়ীও জীবনে পাবে না।

সতীনাথের গৃহত্যাগের পর কথাটা যে কত বড় সত্যি সেটা যেন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে কুন্তী।

বনমালী কাকা না থাকলে যে কি হ'ত কথাটা ভাবতে গিয়েও যেন বুকের ভিতরটা তার হিম হয়ে যায়।

সংবাদটা কুন্তী বনমালী কাকার কাছেই প্রথম পায়।

তার বাপ সতীনাথের কেবল যে একজন প্রথিতযশা চিকিৎসক হিসাবে উপার্জন ছিল তাই নয়, দমদমের ওদিকে একটা ঔষধের কারখানাও ছিল।

এবং সেটা রীতিমত একটা লাভজনক ব্যবসা বছর তিনেক থেকে হয়েছিল। সতীনাথের পরিকল্পনা ছিল ঔষধের কারখানাটাকে বিরাট একটা কিছু গড়ে তোলা।

কুন্তী সব শুনে বলে, বাবার সে স্বপ্নকে কি আমরা সফল করে

তুলতে পারি না বনমালী কাকা ?

কেন পারবে না মা—নিশ্চয়ই পারবে—চেষ্টা করলেই পারবে। কিন্তু তাই বলে তুমি পড়াশোনা বন্ধ করতে এখন পারবে না—

কিন্তু—

তুমি তোমার পড়াশোনা শেষ কর, যতদিন না শেষ হয় আমি আছি—

কুন্তী মনে মনে নিশ্চিন্ত হয়।…

ঐ সময়ই একদিন বাবার স্থাপিত কারখানাটা চোখে একবার দেখবার জন্য বনমালী কাকাকে অনুরোধ জানায় কুন্তী।

বনমালী বলে বেশ তো নিয়ে যাব—

নিয়ে যাব নয়—কবে নিয়ে যাবে বল ?

কবে যেতে চাও তুমি বল ?

কাল—

কালই ?

হ্যাঁ—

বেশ—তাই যাব—

কলেজ থেকে ফিরে পরের দিন বনমালীর সঙ্গে বাপের স্থাপিত ঔষধের কারখানা দেখতে বের হয় কুন্তী—

কারখানায় ঘুরে দেখতে দেখতে এক সময় এসে ল্যাবোরেটরীতে ঢোকে।

সেইখানেই কাজ করছিল শিশিরাংশু।

এম. এস-সি পাশ করে সামান্য মাইনায় ঐ কারখানায় মাস কয়েক হ'ল সে তখন রিসার্চ অ্যাসিষ্টান্ট হয়ে এসে কাজ করছে।

॥ ছয় ॥

ট্রেনটা একটা ব্রীজের উপর দিয়ে পাশ করছিল।

নীচে নদী।

শীতের নদী শীর্ণা, খালি বালি আর বালি তার মধ্যে দিয়ে

কোনমতে ঝির ঝির করে বহে চলেছে ক্ষীণ একটা জলধারা।

প্রথম ভোরের আলো নদীর জলে পড়ে থির থির করে কাঁপছে।

ফিরে তাকাল কুন্তী, সীতা ঘুমাচ্ছে।

হাওয়ায় মাথার চুলগুলো কপালের ওপরে এসে পড়েছে, সস্নেহে হাত দিয়ে চুলগুলো সরিয়ে দেয় কুন্তী।

শিশিরাংশু—শিশিরাংশু নাকি চিঠি দিয়েছে স্কুল সেক্রেটারীকে।

আশ্চর্য!

পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ডাঃ লাহিড়ী, তারই এ্যাসিষ্টাণ্ট হিসাবে কাজ করছিল শিশিরাংশু তখন।

শিশির, কুন্তী চৌধুরী—আমাদের এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেকটার ডাঃ চৌধুরীর মেয়ে।

শিশির তাড়াতাড়ি হাতে তুলে নমস্কার জানায়।

নমস্কার—

মৃদু কণ্ঠে প্রতি নমস্কার জানায় কুন্তী।

ছোটবেলায় গ্রীক্ ফেয়ারি টেলস-এ একটা অ্যাপোলোর ছবি দেখেছিল কুন্তী, ঠিক যেন তেমনি চেহারা—

রংটা ফর্সা নয়, মাজা মাজা, কিন্তু দেহ-সৌষ্ঠবের যেন তুলনা নেই—সুগঠিত, সুঠাম দেহ।

ফিরে এল এক সময় কিন্তু মনের মধ্যে ছাপটা থেকে গেল।

পাঁচ দিনও গেল না, আবার একদিন কুন্তী কাউকে কিছু না বলে একাই কলেজের পর বাসে চেপে দমদম চলে গেল।

সোজা গিয়ে ঢুকল ল্যাবোরেটরীতে। সেদিন ল্যাবোরেটরীতে ডাঃ লাহিড়ী ছিলেন না—একাই শিশিরাংশু কাজ করছিল।

একটা টেষ্ট টিউবে নীল রঙের কি একটা তরল পদার্থ নিয়ে বুনসেন বার্ণারের ফ্রেমে গরম করছিল।

ওটা কি গরম করছেন?

কুন্তীর প্রশ্নে চমকে ফিরে তাকায় শিশিরাংশু, কে—ও আপনি—

কুন্তী মৃদু হাসে।

কখন এলেন আপনি? শুধায় শিশিরাংশু।

এই ত—

কারখানায় কোন কাজ আছে বুঝি?

না তো—

তবে?

কি তবে?

এখানে—কথাটা শেষ করে না—অসম্পূর্ণ রেখেই মুখ তুলে তাকায় শিশিরাংশু কুন্তীর মুখের দিকে।

হঠাৎ যেন কেমন লজ্জাবোধ করে কুন্তী।

সত্যিই তো কি জবাব দেবে ঐ প্রশ্নের। কেন সে এসেছে—হঠাৎ কলেজ থেকে কেন এখানে সে চলে এসেছে ছুটির পর।

এদিকে মাকে—কুন্তী বলে, এদিকে আমার এক বান্ধবী থাকে, তার কাছে এসেছিলাম—

ও—

হঠাৎ মনে হল কারখানাটা ঘুরে যাই, তাই—আচ্ছা চলি, নমস্কার—

কুন্তী আর দাঁড়ায় না—ল্যাবোরেটরী থেকে বের হয়ে পড়ে।

কোন এক সময় বোধ হয় একটা বাগানবাড়ী ছিল, অনেকখানি জায়গা, একটা পুকুরও আছে। মাঝখানে দোতলা একটা পাকা বাড়ি।

সতীনাথ বাড়িটা কিনে আরো কিছু কিছু ঘর তৈরী করে ঔষধের কারখানাটার পত্তন করেছিলেন।

তিন বন্ধুতে মিলে করেছিলেন পত্তন। যদিও অংশে তারই টাকা বেশী ছিল। পরে সেই দুই বন্ধু কিছু কিছু আরো দিলেও সতীনাথের অংশটাই বেশী। এবং সতীনাথই প্রথম থেকে কারখানাটার পিছনে বেশী পরিশ্রম করেছেন।

কথাটা জানতে পেরেছিল কুন্তী তাদের সলিসিটার রায় এণ্ড বোসের কাছ থেকে।

রায় এণ্ড বোসের সিনিয়ার পার্টনার মতি রায়ই বলেছিলেন, আর

দুজন অংশীদার কারখানার থাকলেও তাদের মাত্র দু আনা করে চার আনা অংশ—বাকী বার আনা অংশের মালিক সতীনাথ ও তার দুই মেয়ে—কুন্তী ও মানসী।

এবং কুন্তী ও মানসী প্রাপ্তবয়স্কা হলে কোম্পানীর ডাইরেকটার হবার কথা ছিল। সেদিক দিয়ে কুন্তী গত বছর থেকে একজন ডাইরেকটার।

দুপাশে কিছু একতলা বাড়ি—কিছু পাকা গাঁথুনির উপর অ্যাসবেস্টাসের শেড্—মাঝখান দিয়ে লাল সুরকির রাস্তা ও ধারে ধারে ফুলের কেয়ারি।

সন্ধ্যা হওয়ায় ইতিমধ্যে চারিদিকে আলো জ্বলে উঠেছিল--কুন্তী মাঝখানের রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল।

গেট বরাবর আসতেই পিছনে পায়ের শব্দে ও ফিরে তাকায়।

শিশিরাংশু।

এ কি—আপনি—

হ্যাঁ, কিন্তু আপনার গাড়ি কোথায়? শিশিরাংশু প্রশ্ন করে।

গাড়ি তো আমি আনি নি—

গাড়ি আনেন নি তবে—কিসে এলেন?

কেন, বাসে—

সে কি! বাসে এসেছেন?

কি হয়েছে তাতে, তাছাড়া বাসেই তো আমি যাতায়াত করি—

চলুন—দাঁড়ালেন কেন?

আবার দুজনে হাঁটতে হাঁটতে গেট পার হয়ে আসে। দরোয়ান কুন্তীকে সেলাম দেয়—ইতিমধ্যে সে জেনেছিল গতকালই কুন্তীর পরিচয়টা।

শিশিরাংশু আবার বলে, চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি—

না, না, তার কোন প্রয়োজন হবে না—আমি একাই যেতে পারব—

তা পারবেন জানি—তা হলেও এভাবে একা আপনাকে আমার ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না…তাছাড়া ডাঃ লাহিড়ী শুনলে আমাকে গালাগালি করবেন।

বাঃ, তা কেন করবেন—আমি তো একাই এসেছি, একা চলে যাব—

তা কি হয়, এ কোম্পানীর বলতে গেলে আপনি মালিক।

আমি একা মালিক হব কেন, আমার বোন আছে, আরো দুজন আছেন—

শিশিরাংশু হেসে বলে, আছেন, তবে আপনারা বার আনার মালিক, এবং খোদ ম্যানেজিং ডাইরেকটারের মেয়ে আপনি—

আপনি এত কথা জানলেন কি করে?

কেন, ডাঃ লাহিড়ীই বলছিলেন—

দুজন রাস্তায় বের হয়ে কথা বলতে বলতে বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে যাচ্ছিল—এরোড্রোমের দিক থেকে একটা খালি ট্যাক্সি আসতে দেখে শিশিরাংশু হাত-ইশারায় ট্যাক্সিটা থামাল।

ট্যাক্সিটা সামনে এসে দাঁড়াতেই শিশিরাংশু বলে, উঠুন—

কি দরকার—বাসেই তো অনায়াসে চলে যেতে পারতাম—

পারতেন ঠিকই—আর বাসে এখানকার কেউ আপনাকে দেখলেও হয়ত কিছু মনে করবে না। ভাববে, বিলাসিতা—কিন্তু তা হলেও সেটা উচিত হবে না—নিন উঠুন—

কুন্তী আর কথা বাড়ায় না। ট্যাক্সিতে উঠে বসে।

শিশিরাংশু সামনে উঠতে যাচ্ছিল, কুন্তী বাধা দেয়, বলে, ও কি —সামনে কেন, এদিকে আসুন—

না, না—সামনেই তো আমি বসতে পারব—

পারবেন তা জানি—এদিকে আসুন।

শিশিরাংশু ট্যাক্সিতে উঠে বসতেই ড্রাইভার ট্যাক্সি ছেড়ে দেয়।

কলকাতার দিকে ট্যাক্সি চলে।

কুন্তীই আবার প্রশ্ন করে, তখন বাসে যাওয়া উচিত হবে না কেন বলছিলেন?

একটা কোম্পানীর ডাইরেকটার কখনো বাসে যায় নাকি! তাছাড়া যাবেনই বা কেন? আপনাদের তো অভাব নেই—

অভাব নেই বলেই কি ট্যাক্সিতে যেতে হবে না কি!

দেখুন মিস, চৌধুরী, যে যাই বলুক, আপনার বাসে যাতায়াতটাকে কিন্তু আমি বলব—অহেতুক—

অহেতুক—

তা বৈকি। কি জানেন ঐশ্বর্যের অহঙ্কারটা নিশ্চয়ই ভাল না কিন্তু তার যোগ্য সম্মানটুকু না দিলে যে ঐশ্বর্যকেই ছোট করা হয়—হয়ত বুঝতে পারবেন না ঠিক আমার কথাটা। আমরা নিম্নমধ্যবিত্ত যারা—আমরা যে কি ভাবে আমাদের নিজেদের সঙ্গে আপোষ করবার চেষ্টা করি সেটা আপনারা জানেন না বলেই আপনার মত একজন মানুষের পক্ষে বাস ও ট্যাক্সির পার্থক্যটা স্পষ্ট নয়।

কি জানি কেন শিশিরাংশুর শেষের কথাগুলোতে কেমন যেন লজ্জাবোধ করতে থাকে কুন্তীর, তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্য অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়?

বলে, আপনি কোথায় থাকেন?

বেলেঘাটায়—

তা হলে ট্যাক্সিওয়ালাকে বলুন—সেদিক দিয়ে যেতে—

'তার কোন প্রয়োজন নেই—শিয়ালদহের ধার দিয়ে যাবার সময় আমি নেমে যেতে পারব—

না, না—তা কেন—আপনাকে আপনার বাড়ির দরজায় একেবারে ড্রপ করে দিয়ে যাব।

শিশিরাংশু হেসে ওঠে।

হাসলেন যে—

এই জন্য যে—তার উপায় নেই—

উপায় নেই। কেন—

সে এক জলে-কাদায় সর্বক্ষণ—সর্ব season-এ প্যাচপ্যাচে অন্ধকার গলি—সেখানে গাড়ি ঢোকা তো দূরে থাক, রিক্‌শাও ঢুকতে পারে না, পারে একমাত্র আমাদের মত যারা—পায়ে হেঁটে সন্তর্পণে জামাকাপড় বাঁচিয়ে—

কুন্তীর সেদিন মনে হয়েছিল শিশিরাংশুর কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা ব্যঙ্গের হুল রয়েছে।

সে আর কথাটা বাড়াবার চেষ্টা করে নি, চলন্ত গাড়ির মধ্যে চুপচাপ বসেছিল।

তারপর গাড়িটা যখন শিয়ালদহের কাছাকাছি এসেছে—কুন্তীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে যায় শিশিরাংশু।

সেদিনের কথাটা কুন্তীর আরো বেশী করে মনে আছে। কারণ—বাড়িতে এসে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে তাকে দাঁড়াতে হয়েছিল।

সতীনাথের সংসারে আত্মীয়-স্বজন বা আপনার জন যে ছিল না তা নয়।

কিন্তু কখনো সে সব আত্মীয়-স্বজনদের দেখা দূরে থাক কারো নামও শোনে নি বাবার মুখে কুন্তী। শুধু কথায় কথায় জেনেছিল গ্রামে একদা ওদের পিতামহ রমণীমোহনের আদিনিবাস ছিল এবং রমণীমোহন ছিলেন নাকি অতিরিক্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ।

তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র হয়ে সতীনাথ সে সময় ভালবেসে এক ব্রাহ্ম পরিবারে বিবাহ করেছিলেন, এটা তিনি কোন দিনই ক্ষমা করতে বা ক্ষমার চোখে দেখতে পারেন নি।

যতকাল নাকি বেঁচে ছিলেন পুত্রের মুখদর্শনও করেন নি, নাম পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করেন নি। এবং মৃত্যুর পূর্বে উইল করে গিয়েছিলেন, তাঁর সম্পত্তির এক কপর্দক বা বাস্তুভিটার উপরে কোন দাবিই থাকবে না সতীনাথের।

সতীনাথকে তিনি ত্যাজ্যপুত্র করে গিয়েছিলেন। এবং তার আর এক ছেলে রতিনাথকে সব কিছু দিয়ে গিয়েছিলেন। রতিনাথ গ্রামের বাড়িতেই থাকতেন এবং কোন দিন তাঁকে কুন্তীরা দেখে নি।

গ্রামে থেকে জেলা আদালতে ওকালতি করতেন রতিনাথ।

সেদিন গৃহে ফিরে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেছে কুন্তী, ভৃত্য সাধুচরণ এসে সামনে দাঁড়াল।

বড়দিমণি—

কি রে, মা কেমন আছে ?

ভাল—কিন্তু ওদিকে যে তোমার দেশ থেকে কাকা-কাকীমা ও তার দুই ছেলে এক মেয়ে এসে হাজির—

সে কি—

তুমি কলেজে যাবার কিছুক্ষণ পরেই এসেছেন—এসেই সব তচনচ করে বেড়াচ্ছেন সারা বাড়ি—

কুন্তীর কিন্তু কাকা দেশের বাড়ি থেকে এসেছেন শুনে আনন্দই হয়, সে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে, সত্যি—কোথায় ? কোথায় কাকা—

যান উপরে, দেখুন না গিয়ে, এসেই কত্তাবাবুর ঘরটা দখল করে বসেছেন—

রতিনাথ দেশ থেকে এসেছেন শুনে আনন্দ হয়েছিল কুন্তীর এই কারণে যে এত বড় বাড়িতে মাথার উপরে কেউ নেই—রুগ্না পক্ষাঘাত-গ্রস্তা মা—একমাত্র ছোট বোন মানসী, একা একা যেন কুন্তী হাঁপিয়ে উঠেছিল এই কয়দিনেই—

বাবা চলে যাওয়ায় বাড়িটা যেন একেবারে শূন্য হয়ে গিয়েছিল কুন্তীর কাছে।

একমাত্র বোন মানসী—সে তার চাইতে অনেক ছোট—তা ছাড়া সে তো এখনো ছেলেমানুষ বলতে গেলে—তাকে না যায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করা, না যায় তার কাছে কোন পরামর্শ গ্রহণ করা।

নিজেও সে কয়েকদিন থেকে ভাবছিল, দেশে তো তার কাকা আছেন শুনেছে সে—তাকেই না হয় ডেকে আনবে।

মাথার উপর একজন না থাকলে কেমন যেন অসহায় লাগে বড়।

যাক—কাকা নিজে থাকতেই এসে গেছেন—খুব ভাল হয়েছে।

সাত

তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতেই একটা মোটাসোটা কালো সাধারণ একখানি মিলের লালপাড় শাড়ি পরনে—হাতে শাঁখা, মোটা হাঙ্গরমুখী বালা, মাথায় তেল-সিন্দুরের মস্ত এক টিপ—একজন মহিলার সামনে পড়ে গেল কুন্তী।

সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ে কুন্তী।

মহিলাটি ভ্রূ কুঞ্চিত করে কুন্তীর আপাদমস্তক বার দুই নিরীক্ষণ করে শ্যেনদৃষ্টিতে খনখনে গলায় প্রশ্ন করে, কে গা তুমি ?

কুন্তী ততক্ষণে অনুমান করে নিয়েছে মানুষটি কে।

সেই যে তার সদ্য দেশগ্রাম থেকে আগত তার কাকীমা ছাড়া অন্য কেউ নয় মনে মনে সেটার সম্পর্কে স্থির হয়েই হাসি হাসি মুখে বলে, আপনিই বোধ হয় আমার কাকীমা—আমি কুন্তী, বলতে বলতে কুন্তী এগিয়ে যায় মহিলার পদধূলি নেবার জন্য।

মহিলা অর্থাৎ নিস্তারিণী দেবী তাড়াতাড়ি কুন্তীর স্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য দু পা পিছিয়ে গিয়ে বলে, থাক থাক, ছুঁয়ো না বাপু—একে সর্দির ধাত আমার, এই ভরসন্ধ্যা রাত্রে আবার নাইতে পারব না—

কুন্তী ততক্ষণে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে—কিছুটা ব্যবধানে।

ইতিমধ্যে ওদিককার ঘর থেকে চটি জুতোর চটাস চটাস শব্দ করতে করতে তালগাছের মত রোগা ঢ্যাঙা চিমসে এক পুরুষ—বারান্দায় নিস্তারিণীর পাশে এসে দাঁড়ায়।

এটি কে গিন্নী—তারা—তারা—

আগন্তুকের প্রশ্নে তার দিকে এবারে ভাল করে তাকায় কুন্তী।

মাথাভরা তেলচকচকে বড় বড় বাবরী চুল—কপালে সিন্দুরের ফোঁটা, পরিধানে একটি ধুতি ও বেনিয়ান। গায়ের বর্ণ রীতিমত যাকে বলে গৌর।

তারা—তারা—

চিনতে পারছ না? নিস্তারিণী বলে স্বামীকে।

না তো—

তোমার দাদার কন্যেরত্ন যে এটি—

বল কি!

হ্যাঁ—মাগো মা, এ যে বিয়ে দিলে চার ছেলের মা হয়ে যেত—

আঃ, হঠাৎ ধমকে ওঠে রতিনাথ স্ত্রীকে, থাম তো—কি আবোল-তাবোল সব বকতে শুরু করলে।

তা সত্যি কথা বললে যদি আবোল-তাবোল বকা হয় তো আমি বাপু নাচার—ঢং মিনষের—বলে মুখটা ঘুরিয়ে নিস্তারিণী স্থান ত্যাগ করে।

কুন্তী তখনো পাথরের মত দাঁড়িয়ে।

রতিনাথই কথা বলে, তোমারই নাম মা কুন্তী।

হ্যাঁ—

কুন্তী এবারে কিছুটা সাহস পায়, এগিয়ে গিয়ে রতিনাথের পায়ের ধুলো নেয়।

থাক মা—থাক, বেঁচে থাকো—দেখ মা, তোমাকে না জানিয়ে দাদার ঘরটা আমি ব্যবহার করবার জন্য নিয়েছি—

তাতে কি হয়েছে," বেশ করেছেন—আপনি বাবার ঘরে থাকবেন সে তো ভালই—

আমি জানতাম—আমার মামণি আমায় অসম্মান করবে না। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে তো সব কথা হবে না, চল, ঘরে চল—

কুন্তী রতিনাথের সঙ্গে সঙ্গে অনেকদিন পরে আবার তার বাবার ঘরে এসে ঢুকল।

সতীনাথের গৃহত্যাগের পর আর সে ঘরে পা দেয় নি।

ঘরে তালা দেওয়াই থাকত, কেবল সকালে বিকালে ভৃত্য একবার ঘরটা পরিষ্কার করে রাখত।

কুন্তীরই নির্দেশ ছিল সেটা।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে রতিনাথ বলে, হয়ত একটা কথা তোমার মনে হবে মামণি, আর মনে হওয়াটাও স্বাভাবিক। এতদিন কখনো

আসি নি—একটা চিঠি লিখে তোমাদের কোন খোঁজ-খবর পর্যন্ত নিই নি—আজ হঠাৎ কেন এসে হাজির হলাম—

কুন্তী কি আর বলবে, চেয়ে থাকে কেবল রতিনাথের মুখের দিকে।

তার বাবার মতই কাকার রংটি ফর্সা বটে, কিন্তু আশ্চর্য, মুখটার মধ্যে যেন কোথাও কোন আদল খুঁজে পাচ্ছে না। বাবার মুখের মধ্যে যে একটা শান্ত সৌম্য গাম্ভীর্য ছিল, কাকার মুখের মধ্যে কোথাও যেন সেটা নেই। কোথায় যেন সূক্ষ্ম কি একটা পার্থক্য আছে।

অথচ বাবারই সহোদর ভাই—

আর কখনো তো বাবা কাকার নামও মুখে আনেন নি। কেন—তার ঠাকুর্দা তার বাবার সঙ্গে তার মার বিবাহের জন্য সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিলেন বলেই কি? মনের মধ্যে ঐ মুহূর্তে কুন্তীর সেই কথাগুলোই যেন বার বার উদয় হতে থাকে।

কি জান মা—

রতিনাথের গলার স্বরে চমকে আবার কুন্তী তার মুখের দিকে তাকায়।

রতিনাথ বলে, লজ্জায় বুঝলে মা—লজ্জায়, বাবা দাদার উপর যে অন্যায় বিচার করেছিলেন তার লজ্জাটাই আমাকে সর্বদা দগ্ধ করেছে। মরবার সময় দাদাকে তার এক কপর্দকও দিলেন না—সব দিয়ে গেলেন আমাকে—তারা—তারা।

ও সব কথা থাক কাকা—বাধা দেয় কুন্তী।

কেমন যেন লজ্জা করে তার।

না মা—থাক বললেই আজ আর সেটা চাপা দেওয়া যায় না। তা ছাড়া দাদাকে সম্পত্তিচ্যুত করা মানে তো তোমাদেরও করা—তোমাকে, মানসীকে—দাদা যদি বাবার বিচারে অপরাধী হনও তোমরা তো কোন অপরাধে অপরাধী নও মামণি—তবে তোমরা কেন তা সহ্য করবে। জান মা, একটু থেমে বলে রতিনাথ, সব কিছু যদি আমার জ্ঞাতসারে হ'ত—অর্থাৎ বাবা কিছু করবার সময় যদি আমি তা জানতে পারতাম নিশ্চয়ই বাধা দিতাম, বলতাম, এত বড় অন্যায় করবেন না।

বাবা। কিন্তু তা তো নয়—কিছুই আমি জানতে পারি নি—জানলাম তার মৃত্যুর পর প্রথম। তারা—তারা—

আপনি জানতেন না ?

না—ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি—তারপর তার মৃত্যুর পর যখন জানতে পারলাম—লজ্জায় দাদাকে কিছু জানাতে পারি নি—

কেন ?

দাদা যদি অন্য রকমটা মনে করেন যে আমিই বাবাকে দিয়ে কৌশলে সব লিখিয়ে নিয়েছি—তারা—তারা—

কুন্তী আবার বাধা দেয়, ওসব কথা থাক কাকা—

তুমি ঠিকই বলেছ মা—সেই দাদারই তো মেয়ে তুমি—হবে না কেন, বলবে না কেন—তারা, তারা—আর মনে আমার সেদিন কোন পাপ ছিল না বলেই না—তোমরা কিছু না বলা সত্ত্বেও লোকমুখে দাদার গৃহত্যাগের সংবাদ পেয়েই ছুটে আসছি। তোমাদের এতবড় বিপদ, বৌঠান পঙ্গু—মৃত্যুপথযাত্রী—তোমরা দুটি শিশু, মাথার উপর একজন অভিভাবক নেই তাইত ছুটে এলাম—

বাইরে থেকে ঐ সময় বনমালী সরকারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, মামণি—

আসুন বনমালী কাকা—আমি এই ঘরে—

কুন্তী তাড়াতাড়ি বলে।

একটা খাতা ও চেক বই নিয়ে বনমালী এসে ঘরে ঢোকে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে তাকায় রতিনাথ বনমালীর দিকে—বার কয়েক তার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে কুন্তীর দিকে তাকিয়ে বলে, এ কে মা ?

বনমালী কাকা—বলেই কুন্তী বনমালীর দিকে তাকিয়ে বলে, বনমালী কাকা—ইনি আমার কাকা, দেশ থেকে এসেছেন—

বনমালী গম্ভীর শান্ত কণ্ঠে কেবল বলে, জানি—

আমার নিজের কাকা, বাবার সহোদর ভাই—

কুন্তীর শেষের কথাগুলোর কোন আর জবাব দেয় না বনমালী—রতিনাথের দিকে ফিরেও তাকায় না—তার দিকে তাকিয়েই বলে, তুমি

বোধহয় এখন ব্যস্ত আছ মা—থাক, না হয় কাল সকালেই হিসাবটা দেখ —আর চেক ক'টা সই করে দিও—

না, না,—ওকে, ছেলেমানুষকে আর বিরক্ত করা কেন বনমালীবাবু —আমি যখন এসেই পড়েছি—রতিনাথ বলে ওঠে, ছেলেমানুষ ও, এখন ওর হেসে খেলে বেড়াবার সময়, আমিই ওসব দেখতে পারব। চলুন বরং আপনার ঘরে গিয়ে দুজনে বসা যাক—

বনমালী কিন্তু রতিনাথের কথায় কোনও সাড়াও দেয় না—উৎসাহও দেখায় না।

এমন কি রতিনাথের দিকে ফিরেও তাকায় না—ঘর থেকে বেরুবার জন্য পা বাড়ায় এবং যেতে যেতে বলে, সকালেই তবে হবেখন মামণি—

বনমালী ধীরে ধীরে বের হয়ে গেল।

আর প্রচণ্ড ক্রোধে—অপমানে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল রতিনাথ ঘরের মধ্যে।

কুন্তী যেন নিজেকে হঠাৎ কেমন বিব্রত বোধ করে। অতঃপর তার কি যে করা কর্তব্য—কি করলে শোভন হবে কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারে না।

ঐ সময় প্রশ্ন করে রতিনাথ আবার, লোকটা কে মামণি? এর কথাতো কখনো শুনি নি?

বাবার বন্ধু—

দাদার বন্ধু—তো—

অনেকদিন এখানে আছেন, বাবা ওরই হাতে আমাদের সবকিছু দিয়ে গিয়েছেন—

সে কি! না, না, এ তো ভাল নয়—কোথাকার কে, এতবড় বিরাট সম্পত্তি—

উনি সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী মানুষ—প্রথম জীবনে বিপ্লবী ছিলেন—তার পর দেশ স্বাধীন হলে—

কি বললে, বিপ্লবী—terrorist—তারা—তারা—

হ্যাঁ—

বুঝলে মা, ওরা হচ্ছে দেশের শত্রু—

এ কি বলছেন আপনি—

হ্যাঁ, তুমি জান না, গান্ধীজী কোন দিন ওদের ভাল চোখে দেখেন নি—

না, না—তা কেন হবে, ক্ষুদিরাম, বাঘাযতীন, কানাইলাল, রাসবিহারী, সূর্য সেন—মহাত্মাজী তাঁদের প্রত্যেককে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন।

রতিনাথ অত্যন্ত চতুর মানুষ, সঙ্গে সঙ্গে কথার সুরটা পালটে দেয়।

বলে, না—না মামণি—আমি ঠিক তা বলি নি—terrorist মাত্রেই যে সব দেশপ্রেমিক ছিল তা নয়, তার মধ্যে ছদ্মবেশী অনেক কুখ্যাত ডাকাতও ছিল। যাক গে সে কথা, বনমালীর কথা এখন আমার মনে পড়ছে বটে, দাদার মুখে দু-একবার যেন শুনেছি—তা হলে ঐ সব দেখা শোনা করছে।

হ্যাঁ—আমরা তো সব বুঝি না—ব্যবসা, বিষয়সম্পত্তির ব্যাপার—

তা অবিশ্যি ভালই হয়েছে—মেয়েছেলেরা কি এসব পারে তাও তোমাদের মত বালিকা মাত্র যারা বয়েসে, তবে আর ভয় নেই মামণি, আমি যখন এসে গেছি—তুমি নিশ্চিন্ত থাক, সব আমি দেখে দেব।

কিন্তু দেখা গেল গণ্ডগোল সেইখানেই বেধে গেল সর্বপ্রথমে।

কুন্তী চিনতে পারে নি সেদিন তার কাকাকে কিন্তু বনমালী ঠিকই চিনতে পেরেছিলেন মানুষটাকে। তাই যখনই বিষয়-সম্পত্তি ও ব্যবসার ব্যাপারটা রতিনাথ নিজে হাতে নেবার চেষ্টা করেছে—বনমালী নানা অজুহাত দেখিয়ে পাশ কাটিয়ে যান।

তবে বুদ্ধিমান রতিনাথ, খুব একটা বেশী তাড়াহুড়া করে নি। ধীরে ধীরে সে কঠিন মুঠি বিস্তার করে অগ্রসর হচ্ছিল।

রতিনাথ-গৃহিণী নিস্তারিণী দেবী কিন্তু অত-শতর ধার ধারে নি, সে সোজাসুজি এগিয়ে গিয়েছিল এবং হালহীন অন্দরে সমস্ত কর্তৃত্বটা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়েছিল প্রথম দিনই।

নিস্তারিণীর বেশী বেগ পেতে হয় নি ব্যাপারটায়, কারণ কুন্তীর মা

নর্মদা দেবী অসুস্থ হবার পর অন্দরের ব্যাপারটা তো চাকরবাকর ও ঠাকুররাই যে যার নিজের ইচ্ছা ও খুশি মত অসংলগ্ন ভাবে চালাচ্ছিল।

কুন্তী তো ওসব কখনো মাথা গলাতই না—আর মানসী তো বালিকা বললেও অত্যুক্তি হয় না।

নিস্তারিণী সংসারের হালটা শক্ত হাতে ধরায় কুন্তী বরং স্বস্তি পেয়েছিল—নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচেছিল।

তাছাড়া কুন্তীর জীবনে তখন এসেছে শিশিরাংশু।

॥ আট ॥

শিশিরাংশু তখন কুন্তীর সমস্ত জীবনকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

কেমন করে কি ভাবে যে সে তখন দিনের পর দিন শিশিরাংশুর প্রতি একটা অন্ধ আকর্ষণ অনুভব করেছে—কথাটা ভাবতে গেলে আজও যেন তার বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

কারণ স্বর্ণেন্দুও প্রায় ঠিক সেই সময়ই বলতে গেলে তার জীবনে এসেছে।

শিশিরাংশু আর স্বর্ণেন্দু।

সদ্য ঘুমভাঙা আলোর ভিতর দিয়ে মেল ট্রেনটা তখন কলকাতা অভিমুখে ছুটে চলেছে। বার্থের উপর শুয়ে সীতা এখনো ঘুমাচ্ছে।

বরাবরই সীতার বেলায় ঘুম ভাঙে। কাজেই এখনো তার ঘুম ভাঙার সময় হয় নি। হাওয়ায় সীতার পশমের মত পাতলা চুলগুলো উড়ে উড়ে কেবলই কপালের উপরে এসে পড়ছে। চেয়ে চেয়ে দেখে কুন্তী সীতার ঘুমন্ত মুখখানার দিকে।

আশ্চর্য মিল।

ঠিক যেন মানসীর ছোটবেলার মুখখানা।

ঠিক তেমনি—বাঁ চোখের কোলের কাছে ছোট তিলটা পর্যন্ত।

কিন্তু মানসীর মত গায়ের রং নয়—মানসী তো কালো—যাকে

বলে বেশ কালো।

সতীনাথ ও নর্মদার মধ্যে একজন ছিল কালো, একজন গৌর।

মা ছিল কালো। মায়ের রং পেয়েছে মানসী। আর সে পেয়েছে বাবার রং।

বাবা!

আচ্ছা, বাবা কি আজো বেঁচে আছেন?

সেই যে একদিন রাত্রিশেষে চলে গেলেন আর তাঁর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না—

বনমালী কাকা অনেক খোঁজ করেছিলেন কিন্তু কোন সংবাদই পান নি।

কত বছর হ'ল!

হিসেব করে মনে মনে—তা প্রায় দীর্ঘ নয় বছর হয়ে গেল।

পুজোর পর একবার করে বনমালী কাকা বের হতেন বাবার সন্ধানে—শেষবার ফিরে এসে বলেছিলেন—যোশীমঠের কাছ এক সন্ধ্যায় বাবার মত দেখতে নাকি দেখেছিলেন এক সন্ন্যাসীকে।

আলাপ করবার চেষ্টা করেছিলেন বনমালী কাকা সন্ন্যাসীর সঙ্গে, কিন্তু সন্ন্যাসী আলাপ করেন নি—তিনি মৌনব্রত নিয়েছেন।

মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ ও মাথাভরা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল, পরনে গেরুয়া, তবু বনমালী নাকি তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন।

এবং তিনি যে বনমালীকে চিনেছিলেন সে বিষয়েও তিনি নিঃসন্দেহ!

কুন্তীর ইচ্ছা হয়েছিল বনমালী কাকাকে নিয়ে সে যোশীমঠে যাবে, কিন্তু যাওয়া আর হল না তার।

একটার পর একটা বিপর্যয় তার জীবনে ঘটে গেল মাত্র মাস পাঁচেকের মধ্যে পর পর। এবং বিপর্যয় প্রথমেই হচ্ছে—দীর্ঘ সাত বছর বাদে বনমালী এক সন্ধ্যারাত্রে তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন।

কিন্তু তখন কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল কুন্তী তার চাইতেও বড় বিপর্যয় তার জীবনে ঘনিয়ে এসেছে!

তার জীবনটাই একেবারে ওলোট-পালোট হতে চলেছে।

শিশিরাংশু—

আচ্ছা, কোথায় যেন পড়েছিল কুন্তী Face is the index of man—গোটা মানুষটাই তার মুখের দর্পণে প্রতিফলিত হয়—

বাজে কথা, মিথ্যা কথা—কবি-কল্পনা কিংবা সাহিত্যের সুন্দর একটি কথা।

নচেৎ শিশিরাংশু—যার অমন দেবোপম চেহারা, অমন সুন্দর স্বর্গীয় মুখ—অমন শান্ত স্বপ্নালু স্নিগ্ধ দুটি চোখ—তার ভিতরটা অমন কুৎসিৎ জঘন্য নীচ হল কি করে।

হতে পারেই বা কি করে—

নিজের অজ্ঞাতে বুঝি আবার ফিরে তাকাল কুন্তী—সামনেই বার্থের ওপরে নিদ্রিতা মুখখানার প্রতি—

সীতা, সীতা, তুইও কি অমন হবি মা—

হেসে না রে, হোস না—ঘৃণায় মানুষ থুতু দেবে তোর গায়ে।

আচ্ছা—শিশিরাংশুর চেহারাটা দেখেই ভাল লেগেছিল বলেই কি কুন্তী সেদিন ভুলেছিল।

কিন্তু ভাল লাগা আর ভালবাসা তো এক বস্তু নয়।

সে যে সত্যি সত্যিই শিশিরাংশুকে ভালবেসেছিল।

ভাল লাগা—চোখের নেশা নয়--সত্যিকারের ভালবাসা। যে ভালবাসার জন্য একদিন সে সর্বস্ব ত্যাগ করতেও প্রস্তুত ছিল।

আর করেওনি কি তাই—

বনমালী কাকা চলে যাবার পর সে কি নিজেই ব্যাঙ্কে গিয়ে কাকার নামে চেক সই করবার অধিকার তাকে দেয় নি—

ঔষধের কোম্পানীর ডিরেকটার তাকে করে দেয় নি।

কিন্তু বনমালী কাকা কি যাবার সময় বলে যান নি—স্পষ্ট করেই তো সব বলে গিয়েছিলেন।

অনেকদিন ধরেই বিষের ধোঁয়ার মত ধোঁয়াচ্ছিল ব্যাপারটা।

কিন্তু বনমালী কাকা যেন স্থির প্রতিজ্ঞ, কিছুতেই রতিনাথকে মেনে

নেবেন না।

হাজারো অপমান—বক্রোক্তি—বিরুদ্ধাচরণ তবু—তিনি যেন অচল অটল।

রতিনাথ তখন রীতিমত ক্ষেপে উঠেছেন—

যে কোন প্রকারে তখন তিনি সব কিছু থেকে বনমালীকে সরাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কুন্তী যে ব্যাপারটা একেবারে বুঝতে সেদিন পারেনি তা নয়।

বুঝতে সে পেরেছিল বৈকি, কারণ রতিনাথের আক্রমণটা ছিল স্পষ্ট এবং খোলাখুলি। সে যেন স্পষ্টই যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কুন্তী বেশ একটু যেন ভীতই হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বনমালী কাকার মুখের দিকে তাকালেই সাহসটা যেন সে আবার ফিরে পেত।

তাছাড়া বুঝলেও সব কিন্তু তার মনটা ছিল সে সময় অন্যত্র।

শিশিরাংশু ইতিমধ্যে কুন্তীর কাছে প্রতিশ্রুতি পেয়ে জার্মানীতে যাবার ব্যবস্থা প্রায় শেষ করে এনেছে।

ঔষধের কারখানায় তার রিসার্চের চাকরিটাতে ইস্তফাও দিয়ে দিয়েছে শিশিরাংশু।

অবিশ্যি কুন্তীই তাকে প্ররোচিত করেছিল সে ব্যাপারে।

চাকরিটা কারখানার তুমি ছেড়ে দাও শিশির—কুন্তী বলে।

বল কি—তারপর—

তারপর আবার কি—দুদিন বাদে যে সমস্ত কারখানার মালিক হবে তার পক্ষে সামান্য ঐ চাকরি! তুমিই বল, ভাল দেখায় কি?

কিন্তু—তুমি তো জান কুন্তী—আমার সংসারে বুড়ো মা আছেন—দুটি অবিবাহিতা বোন, তারা কলেজে পড়ে—একটি ছোট ভাই স্কুলে পড়ে। সবই তো আমার ওপরে নির্ভর—

তা জানব না কেন?

তবে?

আমি তো আছি—

প্রথমটায় কুন্তীর ইঙ্গিতটা বুঝতে পারেনি শিশিরাংশু—তাই ওর মুখের দিকে তাকায়।

কুন্তী আরো স্পষ্ট করে তখন বলে, তোমাকে আর আমাকে পৃথক করে দেখছ কেন—

কুন্তী—

কুন্তীর ইঙ্গিতটা তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে শিশিরের কাছে।

হ্যাঁ—তোমার যা দরকার—আমার কাছ থেকেই নিও—

বিয়ের আগেই ?

বিয়ে তো একদিন হবেই—আজ না হয় কাল—

কিন্তু—না, না—ছিঃ, সে আমার বড় লজ্জা করবে—

লজ্জার কি আছে এতে—আর দু মাস বাদে তুমি জার্মানী যাচ্ছ—যাবার আগে আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে যখন—

কুন্তী—

হ্যাঁ, বিয়ের পরে তুমি জার্মানী চলে যাচ্ছ, যতদিন না ফিরে আস আমাকেই তো দেখতে হবে সব—

শিশিরাংশু কুন্তীর হাতটা চেপে ধরে বলে, সত্যি, তুমি আমাকে বাঁচালে কুন্তী, কি দুর্ভাবনা যে ইদানীং আমাকে ধরেছিল—

কুন্তী হাসে—তারপর শান্ত কণ্ঠে বলে, শোন যে জন্য আজ বিশেষ করে তোমাকে আমার প্রয়োজন ছিল—

আজ্ঞা কর দেবী—দাস হুজুরের হাজির—হাসতে হাসতে শিশিরাংশু অভিনয়ের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে।

তোমার যাবার দিনও এগিয়ে এল—এবারে বনমালী কাকাকে আমাদের বিয়ের কথা বলি—

বেশ তো, কিন্তু আমি একটা কথা বলছিলাম—

কি ?

জার্মানী থেকে ফিরে এসে আমাদের বিয়েটা হলে হত না—

কেন ?

তোমাকে একটা বাঁধনে এভাবে বেঁধে যাব—

সে কি কথা—বাঁধন কেন বলছ—তাইত আমরা দুজনে চাইছি আজ—

চাইছি নিশ্চয়ই। কিন্তু—কতরকম আপদ-বিপদ বিদেশে ঘটতে পারে—

ভয় নেই গো—ভয় নেই, আমার শুভেচ্ছা আর ভালবাসা তোমাকে জেনো নির্বিঘ্নে আবার আমার কাছে ঠিক একদিন পৌঁছে দেবে—

এত বিশ্বাস তোমার কুন্তী—

নয় কেন ?

সেই দিন—সেই দিন রাত্রেই গৃহে ফিরে কুন্তী দেখে বাইরের ঘরে স্বর্ণেন্দু বসে আছে একাকী—

স্বর্ণেন্দু ওকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়।

এতদিন আলাপ হয়েছে তবু স্বর্ণেন্দুর কি লজ্জা, কুন্তীর সামনে দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে আজও কথা বলতে পারে না।

ঔষধের কারখানার নতুন ডেপুটি ম্যানেজার হয়ে এসেছে স্বর্ণেন্দু—মাস দশেক আগে।

অনেক অ্যাপ্লিকেশন পড়েছিল পোস্টটার জন্য—ডাইরেকটাররা ইন্টারভিউ নিয়ে ঐ স্বর্ণেন্দুকেই পঞ্চাশজনের মধ্যে পছন্দ করেন।

কুন্তী নিজেও ছিল সিলেকশন বোর্ডে—

বছরখানেক হয় কুন্তী ম্যানেজিং ডাইরেকটার হয়েছে কারখানার, সেই সুবাদেই স্বর্ণেন্দুকে ঘন ঘন আসতে হয় কুন্তীর কাছে।

কি ব্যাপার স্বর্ণেন্দুবাবু, কতক্ষণ—

এই কিছুক্ষণ।

কিন্তু আপনার ফাইল কই ?

সেজন্যে আসিনি—

তবে ?

আমি আপনাদের কাজে রেজিগনেশন দিয়েছি আজ—

সে কি—হঠাৎ কি হ'ল ?

ব্যাপারটা আপনাকে বলা দরকার—আমার রেজিগনেশন লেটারে অবিশ্যি আমি কোন কারণ দর্শাইনি কিন্তু আপনাকে বলব বলেই এসেছি—

বসুন—বসুন, কি ব্যাপার আমায় বলুন।

আমি অবিশ্যি জানতাম না যে—স্বর্ণেন্দু ইতস্ততঃ করতে থাকে।

থামলেন কেন বলুন—

শিশিরাংশুবাবু এ বাড়িতে বিশেষ একজন হয়ে শীঘ্রই আসছেন—

হঠাৎ কুন্তীর কপোল ও কপাল রাঙা হয়ে ওঠে লজ্জায়। সে মাথাটা নীচু করে—

অবিশ্যি—স্বর্ণেন্দু আবার বলে, very very happy news—কিন্তু—

বলুন, থামলেন কেন—

সব হয়ত পাকাপাকি হয়ে গিয়েছে, তাই না?

হুঁ—

তাহলে আমি উঠি—স্বর্ণেন্দু উঠে পড়ে।

না না—বসুন—কি বলতে এসেছিলেন বলুন। মিনতি জানায় কুন্তী।

কিন্তু ভাবছি—

কি?

এ সময় বোধ হয় আমার কথাটা বলা উচিত হবে না—

খুব উচিত হবে। বলুন—কি কথা—

শিশিরাংশুকে কতদিন আপনারা জানেন তা জানি না—আমি কিন্তু তাকে দীর্ঘদিন, মানে, কলেজ-জীবন থেকেই জানি। He was all along a brilliant student সে সবাই জানে—আমরাও জানি—কিন্তু—

কি, থামলেন কেন?

॥ নয় ॥

দেখুন মিস চৌধুরী, স্বর্ণেন্দু একটু থেমে বলে, ক'টা মাস আপনার নুন খেয়েছি—তা ছাড়া আপনাদের কোম্পানী—বিশেষ করে আপনার কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছি কোনদিন তা ভুলতে পারব না—তাই বলছিলাম ব্যাপারটা পাকাপাকি করার আগে শিশিরাংশুবাবুর সম্পর্কে একটু ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখলে বোধ হয় ভালই হয়।

কি বলতে চান আপনি স্বর্ণেন্দুবাবু, স্পষ্ট করে বলুন—

আমি যতদূর জানি—

কি ?

স্বর্ণেন্দু—একটু থেমে যেন একটু ইতস্ততঃ করে বলে, শিশিরাংশুবাবু বিবাহিত—

সে কি !

হ্যাঁ—একই গ্রামে আমাদের বাড়ি—সেখানে এক বিধবা ভদ্রমহিলার মেয়ের সঙ্গে ওর আলাপ হয়—তাকে বিয়ে করেছিল—

তারপর ?

তারপর আমি ঠিক জানি না—তবে সে মেয়েটিকে কিছুদিন আগে দেখলাম এক অফিসে কাজ করতে।

সত্যি, সত্যি বলছেন আপনি স্বর্ণেন্দুবাবু—

আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন না—সেই মেয়েটির মানে শর্মিলার ঠিকানা আমি দিয়ে যাচ্ছি।

কুন্তী যেন হঠাৎ পাথর হয়ে যায়।

অকস্মাৎ যেন সমস্ত পৃথিবীটা শূন্য হয়ে গিয়েছে। কোথায়ও যেন এতটুকু হাওয়াও অবশিষ্ট নেই।

আমি হয়ত আপনাকে আত্যন্ত রূঢ় আঘাত দিলাম মিস্ চৌধুরী, কিন্তু আরো বেশী আঘাতের থেকে আপনাকে বাঁচাবার জন্যই, আর বিশ্বাস করুন আপনাদের মঙ্গল চিন্তা ছাড়া আমার আর কিছুই ছিল না বলেই—আচ্ছা আসি, নমস্কার—

স্বর্ণেন্দু যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায় এবং ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়।

স্বর্ণেন্দুবাবু—

কুন্তীর ডাকে স্বর্ণেন্দু ফিরে দাঁড়ায়।

কিন্তু আপনি তো বললেন না রেজিগনেশন কেন দিলেন?

শিশিরাংশুবাবু গতকাল হঠাৎ অফিসে গিয়েছিলেন—

কেন?

তার নাকি এক মাসের মাইনে প্রাপ্য—

সেই টাকা নিতে গিয়েছিলেন শিশিরাংশুবাবু?

হ্যাঁ—ম্যানেজার ডাঃ ভাদুড়ী ছিলেন না তাই আমার সঙ্গে দেখা করে কথাটা বলেন। তাতে আমি বলি, ম্যানেজার বা আমি কেউই—কমিটির বিনা অনুমতিতে এখন আর তার সম্পর্কে কিছুই করতে পারি না—তাই হঠাৎ তিনি চটে উঠলেন—

তারপর।

যাচ্ছেতাই করে আমাকে বললেন—এবং তখুনি বললেন, শীঘ্রই তিনি কোম্পানীর হর্তাকর্তা হয়ে আসছেন—তখন নাকি তিনি আমার মত দুর্বিনীতকে প্রথমেই যোগ্য শিক্ষা দেবেন।

আপনাকে একথা বললেন!

হ্যাঁ—আর পাশে সে সময় আপনার বোন—

আমার বোন—চমকে ওঠে আবার কুন্তী।

হ্যাঁ, মানসী দেবী তার সঙ্গেই ছিলেন—বুঝতে তখন আমি পারলাম সমস্ত ব্যাপারটাই—টাকা অবিশ্যি তাকে আমি দিইনি, কিন্তু এর পর আর চাকরি করা কি আমার ঠিক হবে, আপনিই বলুন? একটু থেমে আবার বলে স্বর্ণেন্দু, তাই আজ রেজিগনেশন দিয়েছি—

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা স্বর্ণেন্দুবাবু—মানসী—মানসী কারখানায় শিশিরাংশুর সঙ্গে গিয়েছিল কাল, কিন্তু আমার যেন কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

তিনি মানে আপনার বোন মানসী দেবী ছিলেন—আপনি বরং তাকেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন না।

না, না—আপনি যখন বলছেন।

আমি তাহলে আসি। নমস্কার—

নমস্কার—

স্বর্ণেন্দু চলে গেল।

স্বর্ণেন্দু চলে যাবার পরও কুন্তী অনেকক্ষণ সোফাটার উপর ঝিম্ মেরে বসে থাকে।

মানসী শিশিরাংশুর সঙ্গে কারখানায় গিয়েছিল কিন্তু—কেমন করে তা সম্ভবপর হবে? তার কোন এক বান্ধবীর বিয়েতে কাল সেই দুপুরে মানসী চলে গিয়েছে, বলে গিয়েছিল ফিরতে রাত হবে।

গাড়ি নিয়ে যাবার কথায় মানসী বলেছিল, তার কোন প্রয়োজন নেই, তার বান্ধবীই তাকে পৌঁছে দেবে।

আর শিশিরাংশু, তার তো জাহাজের কি সব প্যাসেঞ্জ বুকিংয়ের ব্যাপারে সারাটা দিন ব্যস্ত থাকবার কথা গতকাল।

কতক্ষণ যে কুন্তী বসেছিল সোফাটার উপর নিজেরও খেয়াল নেই, হঠাৎ এক সময় ভৃত্যের ডাকে তার খেয়াল হয়।

বড়দিমণি, আপনি এখানে বসে—

কে, গণেশ?

হ্যাঁ—বড়দিমণি।

হ্যাঁরে—বনমালী কাকা তাঁর ঘরে আছেন?

না তো—তিনি তো এখনো ফেরেননি—

ছোড়দিমণি?

এই তো ফিরলেন—

কুন্তী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

দোতলায় মানসী থাকে। একেবারে বারান্দার শেষ প্রান্তের ঘরটায়।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতেই কানে বাজে দোতলার ক্যাদেল ক্লকটায় ঢং ঢং করে রাত্রি এগারটার ঘোষণা।

অনেক রাত হয়েছে।

এত রাত হয়ে গিয়েছে ও টেরই পায়নি।

বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে কাকার ঘর পড়ে—রতিনাথ বোধহয় তার রাত্রের আহারপর্ব শেষ করলেন—উদগার তুলতে তুলতে তারা নাম স্মরণ করছেন—তারা—তারা—

পা যেন আর চলতে চাইছে না।

কোনমতে টেনে টেনে চলে কুন্তী—মানসীর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল—ঘরের দরজা ভেজান—ভেজান দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের আলো দেখা যায় আর গুনগুন গান শোনা যায়।

মুহূর্তকাল ইতস্ততঃ করে কুন্তী—

তারপর হাত দিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করে—নাইট গাউনটা গায়ে চড়িয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাদা হাতীর দাঁতের চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল মানসী—আয়নার উপর কুন্তীর ছায়া প্রতিফলিত হতেই সে ঘুরে দাঁড়ায়—দিদিভাই—

কুন্তী ততক্ষণে দরজাটা ভিতর থেকে নিঃশব্দে বন্ধ করে দরজার ওপরে পিঠ দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে মানসীর মুখোমুখি।

মানু—

কুন্তীর কঠিন মুখের দিকে চেয়ে মানসী বুঝতে পেরেছিল—বা আঁচ করতে পেরেছিল হয়ত কিছুটা ব্যাপার।

কিছু বলবে ?

তুমি কাল আমার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলেছিলে কেন ?

মিথ্যে কথা বলেছি !

হ্যাঁ—তোমার বান্ধবীর বিয়েতে যাবার নাম করে তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

আমি—আমি মানে—কেন আমি তো—সেখানেই গিয়েছিলাম—

না, যাওনি।

তবে, কোথায় আমি গিয়েছিলাম !

সেইটাই জানতে চাইছি, কোথায় গিয়েছিলে ?

বাঃ রে, তুমি ফোন করে দেখ না—

মানু, চাপা কণ্ঠে যেন গর্জন করে ওঠে কুন্তী, শোন, আমি জানি তুমি কোথায় গিয়েছিলে—তুমি আর শিশিরাংশু—

মানসী এবারে মাথা নীচু করে, আর কোন জবাব নেই তার মুখে।

শিশিরাংশুর সঙ্গে তুমি কারখানায় গিয়েছিলে কেন? জবাব দাও।

সিনেমায় গিয়েছিলাম, ফেরার পথে। শিশিরাংশুদা বললে—কারখানায় ঘুরে যাবে একবার, তাই—

আবার মিথ্যা বলছ—সিনেমায় কোন্ শোতে গিয়েছিলে?

ম্যাটিনী শোতে—

শোন, যেন আর কখনো তোমাকে আমি শিশিরাংশুর সঙ্গে যেতে না দেখি কোথায়ও বা শুনি—মনে থাকে যেন কথাটা।

বলে আর দাঁড়াল না কুন্তী—নিজের ঘরে চলে গেল।

আশ্চর্য—সেদিন কেন চোখ খোলেনি কুন্তীর—

স্বর্ণেন্দুর কথাটা কেন স্পষ্ট বুঝতে পারেনি।

হয়ত বুঝতে পারেনি শিশিরাংশুর চিন্তায় সমস্ত মনটা তার আচ্ছন্ন হয়েছিল বলেই।

স্বর্ণেন্দু তার সম্পর্কে যা বলে গিয়েছে সেই কথাগুলোই মনের মধ্যে তার তোলপাড় করে ফিরছিল বলেই বোধ হয়।

একচক্ষু হরিণের মত একদিক থেকেই সে বিপদের সম্ভাবনা ভেবে সেই দিকে চোখ মেলে রেখেছিল, অন্যদিক থেকে যে বিপদ আসতে পারে ভাবতেও পারে নি।

পরের দিন বিকেলের দিকে শিশিরাংশুর ফোন এল হঠাৎ—

ওদের সিনেমায় যাওয়ার কথা ছিল।

গতরাত থেকে কেবলই ভেবেছে কুন্তী—শিশিরাংশুকে কি করে বলা যায় কথাটা যে—সে সিনেমায় যেতে পারছে না—

কিন্তু তাকে আর বলতে হল না কথাটা—শিশিরাংশুই বললে।

কুন্তী—

বল—

I am very sorry—হঠাৎ একটা বিশেষ কাজে আটকা পড়ে গেছি—আজ আমাদের সিনেমায় যাবার কথা ছিল, আজ পারছি না—please don't mind—লক্ষ্মীটি—

বেশ—

মনে করলে না তো কিছু, রাগ করলে না—

না—

ঠিক বলছ—

ঠিকই বলছি—

ফোনটা নামিয়ে রেখে দেয় কুন্তী, কিছুই যেন আর ভাল লাগছে না।

হঠাৎ যেন সমস্ত দুনিয়াটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু না—এমন করে তো চলতে পারে না।

এর একটা মীমাংসার দরকার।

মুখোমুখি স্পষ্ট করে সব বলা দরকার—শোনা দরকার—

কতবার সে বারণ করে দিয়েছে শিশিরাংশুকে, এখন যেন কারখানার কেউ না জানতে পারে যে তার সঙ্গে শিশিরাংশুর বিয়ে হচ্ছে।

সেই কারণেই সে শিশিরাংশুকে তার কারখানার চাকরি ছাড়াতে পর্যন্ত বাধ্য করেছে।

তাছাড়া তার মা পঙ্গু—শয্যাশায়িনী, তাই সে নিজের বিয়ের ব্যাপারটায় এখনো যেন মন স্থির করতে পারছিল না।

সবাই কি দৃষ্টিতে দেখবে ব্যাপারটা—একটা লজ্জাবোধও যেন তাকে পীড়ন করছিল, তা ছাড়া তার ও শিশিরাংশুর ভালবাসার ব্যাপারটা সে সযতনে নিজেদের মধ্যেই কেবল রেখেছিল—পাছে কেউ জানতে পারে বলে খুব সাবধানে মেলামেশা করেছে—

কিন্তু শিশিরাংশু এটা কি করল!

তখন যদি জানত কুন্তী, শিশিরাংশু আরো অনেক বেশী এগিয়ে গিয়েছে—

ঐ দিনই সন্ধ্যায়—

ডাঃ ভাদুড়ীর কাছ থেকে ফোন এল—

বিশেষ প্রয়োজন আছে—কুন্তী যেন—অবিলম্বে তার বাড়িতে গিয়ে একটিবার দেখা করে এখুনি—

কুন্তী চিন্তিত মনে তখনি গাড়ি নিয়ে বের হয়ে পড়ে—

বেশী দূর নয় ডাঃ ভাদুড়ীর বাড়ি।

ডাঃ ভাদুড়ী তাঁর বসবার ঘরে একাই ছিলেন। কুন্তীকে ঘরে ঢুকতে দেখে বললেন, বস মা।

কুন্তী বসল।

আজ অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছি মা—শিশিরাংশু—

কি করেছে সে ?

তার সঙ্গে যে তোমাদের এতটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে ইতিমধ্যে—তা অবশ্যই আমি জানতাম না—

কি হয়েছে আমাকে খুলে বলুন।

সে আজ আমার অফিসে এসেছিল—

কখন ?

দুপুরে, এসে তার মাইনে চায়—তাতে আমি তোমার কথা বলি—সে তখন বলে—

কি বলেছে ?

সে কথাটা আর নাই বা শুনলে মা—

কুন্তী অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, স্বর্ণেন্দুবাবু কি আর অফিসে আসছেন না ?

না।

তাঁর রেজিগনেশন আপনারা অ্যাক্সেপ্ট করেছেন ?

এখনো কিছু করিনি—

ঠিক আছে, আপনি একটা মিটিংয়ে ওঁকেও ডাকুন—আর একটা কথা—শিশিরাংশুবাবু এবারে এলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন—

কিন্তু মা, আমি আর কাজ করতে পারব না।

কেন ভাদুড়ী কাকা ?

কাল যখন সত্যিই তোমাদের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠবে—

গড়ে যে উঠবেই সে সম্পর্কে আপনি স্থিরনিশ্চিত এখন থেকেই বা কেন হচ্ছেন ?

কুন্তী—

আজ আমি চলি—

কুন্তী ঘর থেকে বের হয়ে এল।

গাড়িতে বসে তার মনে হয় একবার শিশিরাংশুর সঙ্গে দেখা হওয়া একান্ত দরকার—জার্মানীতে যাবে বলে কিছুদিন হল শিশিরাংশু তার মা ও ভাইবোনদের দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে কুন্তীরই টাকায় একটা হোটেলে বর্তমানে ঘর নিয়ে আছে।

কুন্তী ড্রাইভারকে বললে, সেই হোটেলে যেতে।

হোটেলে যখন এসে পৌঁছল রাত তখন প্রায় সোয়া নয়টা।

হোটেলের চাকর বললে, বাবু নেই, কে এক দিদিমণি এসেছিল তার সঙ্গে বের হয়েছে—

কুন্তী বলে, দরজাটা খুলে দাও—

ভৃত্য জানত কুন্তীর পরিচয়—ম্যানেজারের কাছ থেকে চাবি এনে দরজা খুলে দিল।

কুন্তী ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসল অন্ধকারেই। আলোটা আর জ্বালায় না।

॥ দশ ॥

প্রায় এক ঘণ্টা পরে শিশিরাংশু এল।

অন্ধকার ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বালতেই সামনে চেয়ারে উপবিষ্ট কুন্তীকে দেখে থমকে দাঁড়াল শিশিরাংশু।

তুমি—

হ্যাঁ আমি—শান্ত কণ্ঠে কুন্তী বলে ওর মুখের দিকে দু'চোখের দৃষ্টি ন্যস্ত করে।

কি সৌভাগ্য, এতদিন পরে তা হলে এলে—কিন্তু অন্ধকারে অমন করে ভূতের মত বসেছিলে কেন ?

শিশিরাংশু—

শিশিরাংশু একটা সিগ্রেটে অগ্নিসংযোগ করছিল, ফিরে তাকাল কুন্তীর কণ্ঠস্বরে—কুন্তীর শেষের দিকের কণ্ঠস্বরটার মধ্যে কোথায় যেন একটা চমক আছে তার মনে হলো হঠাৎ।

শিশিরাংশু নিজের অজ্ঞাতেই যেন থমকে যায়, সিগ্রেটে অগ্নি সংযোগ করা আর হয় না—হাতের সিগ্রেট ও লাইটার হাতেই ধরা থাকে।

কিছু যেন তুমি বলবে—বলতে চাও মনে হচ্ছে কুন্তী ?

আশ্চর্য শান্ত শিশিরাংশুর কণ্ঠস্বর।

মুহূর্ত পূর্বে সে যে চমকে উঠেছিল সেটা যেন সে ততক্ষণে সামলে নিয়েছে।

বলব বলেই আমি এসেছিলাম শিশিরাংশু, কিন্তু—

কিন্তু কি, থামলে কেন ?

না থাক—

থাক কেন বল না কি বলতে এসেছিলে।

না।

বেশ তবে বলো না—

কাদা ঘাঁটলেই তার কিছুটা গায়ে ছিটকে আসবেই—কিন্তু আমি, আমি তো তোমার সঙ্গে কোন প্রতারণা করি নি শিশিরাংশু তবে তুমি—

কি আমি, কুন্তী—

তুমি এমন হীন জঘন্য ব্যবহার, এমন কুৎসিত প্রতারণা আমার সঙ্গে করলে কেন ?

প্রতারণা, এসব কি বলছ কুন্তী, আমি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছি—

শর্মিলা কে—

কুন্তীর মনে হল হঠাৎ যেন নামটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই শিশিরাংশুর সমস্ত মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল কিন্তু তা সামলে নিতেও তার দেরী হয় না সঙ্গে সঙ্গে।

কেন বলত।

মনে হচ্ছে নামটার সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে—

তা আছে বৈকি—

আছে?

অতঃপর একটু থেমে সিগ্রেটটা অগ্নি সংযোগ করে, সিগ্রেটে একটা মৃদু টান দিয়ে বলে, হুঁ—অবিশ্যি আমিই তোমাকে বলতাম—

বলতে? বিস্ময়ের যেন অবধি নেই কুন্তীর।

বলতাম বৈ কি—

কি বলতে, যে শর্মিলার সঙ্গে একদিন তোমার বিয়ে হয়েছে, এবং—

থাম, থাম, don't be so melodramatic—কুন্তী—

Melodramatic?

তা বৈ কি! প্রথম যৌবনে একটি অপরিণতবুদ্ধি পুরুষের যেমন কোন তরুণী মেয়েকে দেখলেই চোখে নেশা ধরে—ঠিক তাই it was nothing more than that—

শিশিরাংশু—একটা অস্ফুট চিৎকার যেন বার হয়ে আসে কুন্তীর কণ্ঠ থেকে।

পূর্ববৎ শান্ত কণ্ঠে বলে চলে শিশিরাংশু, and we also lived together a few days—say a few months—

তুমি তাকে বিয়ে কর নি?

হ্যাঁ, কে জানে, হয়ত এলে-বেলে কয়েকটা অর্থহীন মন্ত্র পড়েছিলামও, কিন্তু সত্যিকারের আসল বিয়ে তো কয়েকটা ঐ মন্ত্র পড়া ও সামান্য একটু চোখের নেশা মাত্র নয় কুন্তী—

তার মানে সেটাকে তুমি বিয়ে বল না?

না—

বল না?

না, আর সেই কারণেই শর্মিলার পরবর্তীকালের ব্যাপার নিয়ে আমি এতটুকুও মাথা ঘামাই নি, She is as free as I am—

কুন্তী যেন বোবা হয়ে গিয়েছে। গলা দিয়ে আর কোন শব্দ বের হয় না।

কথা বলার শেষ শক্তিটুকুও যেন কুন্তীর ঐ মুহূর্তে লোপ পেয়েছে। ঘটনার আকস্মিকতায়—বিস্ময়ে অভিভূত কুন্তী কেবল নিঃশব্দে শিশিরাংশুর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

শিশিরাংশু কিন্তু নির্বিকার, একান্ত নির্বিকার।

এতটুকু বিস্মিত বা এতটুকু অপ্রস্তুতও যেন হয় নি লোকটা!

মনে হয় কুন্তীর ঐ শিশিরাংশুকে সে তো চেনে না।

অথচ—এই দুটো বছর কি এক অন্ধ আবেগেই না ওকে সে আঁকড়ে ধরে ছিল।

ঐ মানুষটা শুধু তাকে মুগ্ধই করে নি—ওকে সে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালও বেসেছে। আর সেই ভালবাসার উপরেই নাকি এক মধুর ভবিষ্যৎ সে গড়ে তুলছিল তিল তিল করে।

এবং আজ অকস্মাৎ ব্যাপারটা ঐভাবে তার গোচরীভূত না হলে—কয়েকদিনের মধ্যেই তো তাদের রেজেস্ট্রি ম্যারেজ হয়ে যাবার কথা।

উঃ, যদি না জানতে পারত, বিয়েটা তো হয়ে যেত।

হাসতে হাসতেই ঐ লোকটা হয়ত তাকে চরম সর্বনাশ ও দুঃসহ অবর্ণনীয় এক লজ্জার মধ্যে টেনে নিয়ে যেত। এতটুকু বিবেকে হয়ত বাধত না লোকটার।

সিগ্রেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে শান্ত কণ্ঠে শিশিরাংশু বলে, তুমি যেন হঠাৎ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লে বলে মনে হচ্ছে কুন্তী।

কুন্তী চেয়ে আছে তখনো ওর মুখের দিকে নিঃশব্দে, কোন জবাব দেয় না।

হাতের জ্বলন্ত সিগ্রেটের অগ্রভাগের ছাইটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলে

আবার শিশিরাংশু তেমনি ঠাণ্ডা গলায়—তুমি জেনে ফেলেছ হুদিন আগে—well and good অবিশ্যি—otherwise আমিই বলতাম। কয়েকদিন ভাবিনি যে বলব তাও নয়, বলব, বলব করেও বলা হয়ে ওঠেনি, আবার কখনও এও ভেবেছি, কি এমন একটা ব্যাপার যা তোমার কর্ণগোচর করতেই হবে।

কথাগুলো শেষ হল না শিশিরাংশুর—হঠাৎ যেন সে বলতে বলতে থেমে গেল।

সামনে উপবিষ্ট কুন্তীর মুখের দিকে হঠাৎ বুঝি চোখ পড়াতেই থেমে গেল শিশিরাংশু।

কুন্তী তখনো পর্যন্ত চুপ করেই আছে, একটি কথাও বলেনি—

তার হু'চোখের কোল বেয়ে দুটি অশ্রুর ধারা নেমেছে।

What's up, ব্যাপার কি, are you really serious, কাঁদছ নাকি?

শিশিরাংশুর কণ্ঠস্বরে যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ময়।

কথা বলল। এতক্ষণ পরে প্রথম কথা বলল কুন্তী।

বললে, এ তুমি কি করলে শিশিরাংশু—

কুন্তী—

তুমি যে আমার সমস্ত কল্পনা, সমস্ত সম্ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলে।

ঐ দেখ, কি সব শুরু করে দিলে।

শিশিরাংশু যেন ব্যাপারটা হালকা করে দেবার চেষ্টা করে।

কুন্তী বললে, সব তুমি এমনি করে নষ্ট করে দিলে।

এঃ সত্যি, তুমি দেখছি অত্যন্ত sentimental, বলতে বলতে শিশিরাংশু কুন্তীর হাতটা ধরবার জন্য দু পা এগিয়ে আসতেই—কুন্তী ছোঁয়া বাঁচিয়ে যেন সরে যায়।

কুন্তী—

না, না—তুমি আমাকে আর ছুঁয়ো না—

কি পাগলামি করছ—শিশিরাংশু আবার এগিয়ে আসবার চেষ্টা করে। আবার ঘন হবার চেষ্টা করে।

কুন্তী আরো দূরে সরে যায়। বলে, না।

কুন্তী—

না, শিশিরাংশু, না—

কুন্তী যেন ক্ষীণ কণ্ঠে এবারে একটা আর্তনাদ করে ওঠে।

তুমি—

শেষ করতে দেয় না শিশিরাংশুকে কথাটা তার কুন্তী—বলে, ছিঃ তুমি অন্যের স্বামী—

কুন্তী—

তুমি শর্মিলার স্বামী—তুমি আর একজনের—

শোন, শোন, একটা তুচ্ছ ব্যাপারকে তুমি এমন জটিল করে তুলছ—

এর চাইতেও জটিল মানুষের জীবনে আর কি থাকতে পারে শিশিরাংশু, মনে হয়েছিল কথাটা বলে কিন্তু ঘৃণায় লজ্জায় যেন কণ্ঠ তখন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, আর তখন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবার মত শক্তিও বুঝি নেই, তাই যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়ায় কুন্তী নিঃশব্দে শেষবারের মত যেন একবার ওর দিকে তাকিয়ে।

শিশিরাংশু তাড়াতাড়ি দরজার দিকে একটু এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে, শোন কুন্তী, শোন—

এবারেও কোন জবাব দেয় না—আরো দু'পা এগিয়ে যায় কেবল দরজার কাছে।

শিশিরাংশু বোধ হয় এতক্ষণে নিঃসন্দেহ হয়েছিল, কুন্তী সত্যিই চলে যাচ্ছে।

সে এবারে দরজাটা আগলে দাঁড়ায়, কুন্তী I must tell you frankly—আমি কিন্তু ভাবতে পারিনি—

কি ভাবতে পারনি ?

তুমি—

পথ ছাড় শিশিরাংশু—

কুন্তী !

পথ ছাড়—শিশিরাংশু আমাকে যেতে দাও।

তা হলে আমাদের—

হ্যাঁ, এইখানেই শেষ।

আমি কিন্তু বলব, একটু বাড়াবাড়িই হয়ে যাচ্ছে, আজকালকার যুগে এ ধরনের ঘটনা—

চুপ কর শিশিরাংশু, তোমার লজ্জা ঘৃণা বলে কোন বস্তুর বালাই না থাকতে পারে কিন্তু আমার সর্বাঙ্গ ঘৃণায় লজ্জায় যেন ঘিনঘিন করছে।

ওঃ—

হ্যাঁ—আর একটা কথা শোন, যা আমি বলে গেলাম এই আমার শেষ কথা।

শেষ কথা—

হ্যাঁ—শেষ কথা, এর পর কোন কারণেই যেন ব্যাপারটা আরো তিক্ত করবার চেষ্টা তুমি করো না—

তোমার বুঝি ধারণা তাই আমার সম্পর্কে?

তাই, আর একটা কথা, স্বর্ণেন্দুবাবুর কাছে শুনলাম তুমি নাকি আমাদের কারখানার অফিসে তোমার কি সব প্রাপ্য টাকার জন্য গিয়েছিলে, সেখানে আর তুমি যাবার চেষ্টা করো না। তোমার প্রাপ্য যদি কিছু থাকে তো তোমাকে ডাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে—

আর কিছু বল—মনে হচ্ছে কুন্তী তুমি আরো কিছু যেন বলবে—

শিশিরাংশুর কণ্ঠস্বরটা তখন বেশ পরিবর্তিত মনে হয়।

ক্ষণপূর্বের কণ্ঠের সেই সহজ সুরটা আর নেই। একটা চাপা ব্যঙ্গের বিদ্যুৎ যেন কণ্ঠস্বরে ঝিলিক দিয়ে গেল।

কুন্তী কিন্তু শান্ত কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ—তোমাকে জার্মানী যাবার জন্য যে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম—সেটাও তুমি পাবে—

ধন্যবাদ, আর কিছু?

আর যতদিন জার্মানী না যাও এই হোটেলের থাকবার খরচাটাও আমি দেব কারণ তোমাকে আমিই এখানে এনে তুলেছিলাম—

আবারো ধন্যবাদ—তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কুন্তী দেবী, তোমার বদান্যতা, দাক্ষিণ্য, সত্যিই প্রশংসনীয়। এখন অবিশ্যি আমি বুঝতে

পারছি, হঠাৎ তোমার এই পরিবর্তনের কারণ কি—তা হলে স্বর্ণেন্দুই আজ তোমার আপনার জন হয়েছে—সেই লোফার, দুশ্চরিত্রটা—

থাম—হঠাৎ যেন গর্জন করে ওঠে কুন্তী, নিজের চরিত্র দিয়ে সকলকে বিচার করো না—

ওঃ এত দূর—তা হলে অনেকটা এগিয়েছো বল—

ইচ্ছা হয়েছিল কুন্তীর ঐ মুহূর্তে পায়ের জুতোটা খুলে শিশিরাংশুর গালে-মুখে বসিয়ে দেয় কয়েক ঘা কিন্তু ওকে স্পর্শ করতেও যেন তখন তার ঘৃণা হচ্ছিল।

শুধু বললে, হ্যাঁ—তোমার প্রাপ্যের জন্য তার কাছেই তোমাকে জানাতে হবে—সেটা মনে রেখ—

তা রাখতে হবে বৈকি মনে—যেন একটা বিষধর সর্পের মত হিস্ হিস্ করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তখন শিশিরাংশু।

সে বলে তীক্ষ্ণ শ্লেষ ভরা কণ্ঠে, তবে কুন্তী দেবী, তোমারও একটা কথা জানা দরকার—এর পরও যদি তুমি মনে করে থাক—শিশিরাংশু তোমার দাক্ষিণ্যের জন্যই তার হাত দুটো পেতে রাখবে তো ভুল করেছ—

কুন্তী তাকিয়েছিল শিশিরাংশুর মুখের দিকে।

শিশিরাংশুর কণ্ঠস্বরে যেন তখন বিষ ঝরে পড়ছিল।

সে বলে, হ্যাঁ, জেনে যাও—তোমার জন্য আমি কোন দিনই বসে-ছিলাম না, আর আজও নেই—নিজের চেহারাটা বোধ হয় অনেকদিন আয়নায় দেখ না—বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখ—

তীক্ষ্ণ আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে কুন্তী, শিশিরাংশু—

শিশিরাংশু আরো বিষ কণ্ঠে ঢেলে বলে, ভেবেছ স্বর্ণেন্দুকে ঐ চেহারা দিয়ে ভোলাবে কিন্তু জেনো—he is not an idiot—

আর সহ্য করতে পারে না কুন্তী, মুহূর্তে যেন একটা তীব্র অপমানের জ্বালা তার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত ছড়িয়ে যায়, সে যেন মুহূর্তের জন্য অন্ধ হয়ে যায়—ঠাস্ করে শিশিবাংশুর গালে একটা চড় বসিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, ইতর—

আর দাঁড়ায় না কুন্তী, দাঁড়াবার আর তার শক্তি নেই তখন।

সমস্ত শরীরটা তার তখন থর থর করে কাঁপছে।

ঝিম্ ঝিম্ করছে সমস্ত চেতনা।

টলতে টলতে কোন মতে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেও শিশিরাংশুর বিষাক্ত কণ্ঠস্বরের শেষ কথাগুলো যেন তার কানে বাজতে থাকে, ভেবেছ স্বর্ণেন্দুকে তোমার ঐ চেহারা দিয়ে ভোলাবে কিন্তু he is not an idiot—

কি করে যে হোটেলের সিঁড়িগুলো অতিক্রম করে এক সময় কুন্তী গাড়ির মধ্যে এসে উঠে বসেছিল কিছুই তার মনে নেই।

। এগারো ।

ড্রাইভার যখন জিজ্ঞাসা করেছিল, কোথায় যাবে—তখনো কোন জবাব দেয়নি কুন্তী।

গাড়ির ব্যাক সীটে হেলান দিয়ে পড়ে ছিল।

অনেক দিনের পুরানো ড্রাইভার কি সে বুঝেছিল কে জানে—সোজা বাড়ির দিকেই গাড়ি চালিয়েছিল। গাড়ি ছুটে চলেছে, চারিদিকে কর্মব্যস্ত প্রবহমান জনস্রোত কিন্তু কোন দিকেই কোন দৃষ্টি ছিল না তখন কুন্তীর।

সেই যে গাড়িতে ঢুকে মাথাটা নীচু করে হেলান দিয়ে বসেছিল সারাটা পথ আর মাথা তোলেনি, এক সময় গাড়িটা এসে বাড়ির সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করে পোর্টিকোর নীচে এসে দাঁড়াল।

ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে দিল, দিদিমণি—

সেই ডাকে কুন্তী মুখ তুলে তাকায়।

ড্রাইভার আবার বলে, দিদিমণি, কোঠি-আগিয়া—

কুন্তী গাড়ি থেকে নেমে এল।

তারপর টলতে টলতে সামনের হলঘরে গিয়ে প্রবেশ করল।

রতিনাথ কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে হলঘরে আসর জমিয়ে বসে-

ছিলেন—কুন্তীকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে বলেন, এই যে কুন্তী এঁরা সব তোমার কাছে এসেছেন, অনেকক্ষণ ধরে তোমার সঙ্গে দেখা করবেন বলে বসে আছেন—

কেমন যেন শূন্য বোবা দৃষ্টিতে একবার মাত্র রতিনাথ ও অন্যান্যদের মুখের দিকে তাকাল কুন্তী তারপর ঘর থেকে বের হয়ে গেল একটি কথাও না বলে।

ঘরের মধ্যে ঐ মুহূর্তে উপস্থিত সকলে ফ্যালফ্যাল করে কুন্তীর গমনপথের দিকে চেয়ে রইল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে, বারান্দা অতিক্রম করে নিজের ঘরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল কুন্তী।

মনে হল অন্ধকার ঘরের মধ্যে কে যেন চেয়ারটার উপর বসে আছে।

ওদিককার দোতালা বাড়ির একটা ঘরের খানিকটা আলো জানালা-পথে তার ঘরে এসে ঢুকেছে—সেই আলোতেই ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দেখতে পায় কুন্তী।

বলে, কে—কে ওখানে?

আমি, মৃদু কণ্ঠে জবাব এল।

কে—মানু—

বলতে বলতে কুন্তী একটু যেন বিস্মিত হয়েই হাত বাড়িয়ে ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দেয় সুইচটা টিপে।

উজ্জ্বল আলোয় ঘর ভরে যায়।

কুন্তী দেখে চেয়ারের উপরে মানসী বসে চুপটি করে।

কেমন যেন ধ্বক করে উঠেছিল ঐ মুহূর্তে বুকের মধ্যে কুন্তীর—মানসীর মুখের দিকে তাকাতেই।

মানসীই প্রথমে কথা বলে, দিদিভাই—

কুন্তী তখনো চেয়ে আছে বোনের মুখের দিকে।

কি হয়েছে দিদিভাই—মানসী প্রশ্ন করে, তোমার মুখটা অমন শুক্‌নো কেন?

ও কিছু না—তুই এখানে বসে যে—

আমি—

কিছু বলবি ?

হ্যাঁ, মানে—

কি—

দিদিভাই—

কি ?

তোমার কাছে আমি অনুমতি চাইব বলে বসে আছি—

অনুমতি ? কিসের অনুমতি মানু—

আমি— মানসী মাথাটা নীচু করে।

কুন্তীর সঙ্গে বয়েসের তার অনেক পার্থক্য। বয়েসের সেই ব্যবধানটা চিরদিন দু'জনার মধ্যে একটা সম্ভ্রমের প্রাচীর তুলে রেখেছিল।

তাছাড়া চিরদিন একটু রাশভারী—গম্ভীর প্রকৃতির কুন্তী—সকলে সব সময় তার সামনে এগুতে ঠিক যেন সাহস পেত না।

দুই বোনের পরস্পরের মধ্যে অবশ্য একটা ভালবাসার সম্পর্ক ছিল তথাপি বয়সের ঐ ব্যবধানটা ও কুন্তীর চরিত্রের গাম্ভীর্য ঠিক সহজ একটা ঘনিষ্ঠতায় কোনদিন বোধহয় দুজনকে আসতে দেয়নি, সংযম গাম্ভীর্য ও চারিত্রিক বলিষ্ঠতায় কুন্তীর মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছিল।

একটা আভিজাত্য দিয়েছিল এবং যেখানে সে সংসারের মধ্যে থেকেও এক স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করেছিল। বাড়ির মধ্যে সকলেই কুন্তীকে সেই কারণে সমীহ করে চলত।

রতিনাথও সেই কারণেই ইচ্ছা থাকলেও তার লোভের হাতটা বোধকরি গুটিয়ে রেখেছিল।

এবং স্ত্রীর দিক থেকে অবিরত তাগিদ এলেও বিশেষ অগ্রসর হতে সাহস পাচ্ছিল না মনের মধ্যে।

কুন্তী কথা বলত কম এবং নিজের ঘরের মধ্যেই সর্বদা প্রায় লেখাপড়া নিয়ে বা অন্য কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকত।

এবং যতক্ষণ সে বাড়িতে থাকত প্রত্যেকেই বুঝতে পারত যেন সে বাড়ির মধ্যে কোথায়ও না কোথায়ও আছে।

মানসী যদিও কুন্তীর কাছ থেকে বরাবর যথেষ্ট ভালবাসা, স্নেহ ও প্রশ্রয় পেয়েছে তবু সে দিদিভাইকে মনে মনে ভয় করত।

তাই বুঝি কথাটা বলতে গিয়েও মানসী থিতিয়ে যায়।

কুণ্ঠায় কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে আসে।

কিন্তু কথাটা যে না বললেও নয়। মানসীকে কথাটা যে বলতেই হবে।

যা হোক মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে কুন্তীই আবার প্রশ্ন করে, কিছু বলবি ?

দিদিভাই—

কি বলবি, বল না ?

না থাক, অন্য এক সময় না হয় বলব—

না—কি বলতে চাস বল ? কিসের অনুমতি চাইছিলি ?

বলছিলাম আমি—আমি বিয়ে করব—

বিয়ে করবি ?

হ্যাঁ—

কয়েকটা মুহূর্ত যেন কুন্তীর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হয় না।

চেয়ে থাকে ছোট বোনের মুখের দিকে—

তারপর ধীরে ধীরে এক সময় বলে, বিয়ে—তুই বিয়ে করবি ?

হ্যাঁ—

মাথাটা নীচু করে মানসী।

তুই বিয়ে করতে চাস ?

হ্যাঁ দিদিভাই তাই তোমার অনুমতি—

কে সে ? কাকে বিয়ে করতে চাস।

তুমি তাকে অবিশ্যি চেন—

আবার বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খায় যেন কুন্তী।

বলে, আমি তাকে চিনি ?

হ্যাঁ, চেন। ভাল করেই চেন—

কিন্তু কে সে? কি নাম তার?

তার নাম?

হ্যাঁ—কি নাম তার?

শিশিরাংশু।

নামটা উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে আবার মাথাটা নীচু করে মানসী।

কি—কি বললি—কাকে বিয়ে করতে চাস তুই?

একটা প্রচণ্ড ইলেকট্রিক শক্ খেয়েছে যেন কুন্তী।

গলা দিয়ে অর্ধস্ফুট একটা শব্দের মতই যেন কথাগুলো বের হয়ে আসে কুন্তীর।

কি শুনছে সে—মানসী শিশিরাংশুকে বিয়ে করতে চায়!

ঠিক শুনেছে তো, না ভুল শুনলো সে—

তুই—তুই শিশিরাংশুকে বিয়ে করতে চাস?

হ্যাঁ—

না—না—না—

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে যেন প্রতিবাদ জানায় এতক্ষণে কুন্তী।

দিদিভাই—

না, না, এ হতে পারে না—

দিদিভাই—

এ বিয়ে হতে পারে না—

হতে পারে না?

না, না—

কিন্তু আমি যে—

মানসীকে বলতে দেয় না কুন্তী—তীক্ষ্ণ প্রতিবাদে যেন ঝলসে ওঠে, বলছি এ বিয়ে হতে পারে না—এর মধ্যে আর কোন কথা—কোন কিন্তু নেই মানু—এ হতে পারে না।

কিন্তু কেন—কেন হতে পারে না?

আমি বলছি এ বিয়ে হতে পারে না—আর কোন প্রশ্ন করিস না আমাকে—যা এঘর থেকে—

কিন্তু দিদিভাই—

যা—যা বলছি এঘর থেকে—

না, আমি যাব না—কেন হতে পারে না তোমাকে বলতেই হবে—

কি বললি—বলতে হবে—

মুহূর্তে আক্রোশে যেন ফেটে পড়ল কুন্তী—এলোপাথাড়ি বোনের দু'গালে গোটাকতক চড় বসিয়ে দেয়—যে বোনের গায়ে কখনো হাত আজ পর্যন্ত তোলেনি।

ঐ ভাবে কুন্তীর হাতে চড় খেয়ে মানসীও যেন হঠাৎ থমকে যায়, বোবা হয়ে যায়।

কুন্তী তখনও হাঁপাচ্ছে।

মানসী ধীরে ধীরে ঘর থেকে চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়।

কুন্তী আর নিজেকে রোধ করতে পারে না।

ছুটে গিয়ে দু'হাতে মানসীকে জড়িয়ে ধরে, মানু—

ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও তুমি আমায়—

মানসী জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে।

কিন্তু কুন্তী ছাড়ে না বোনকে। বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে থাকে।

শোন, শোন—তুই জানিস না—

মানসী বলে, জানি—আমি সব জানি—

কি জানিস তুই—কিছুই জানিস না ঐ মানুষটা সম্পর্কে তুই, he is a liar, নীচ ভালগার—

ছেড়ে দাও তুমি আমায়—

শোন মানু, শোন, আমি বলছি, তুই ভুলে যা তাকে ভাই—

ও ঠিকই বলেছিল, তুমি শুনলে হয়ত বাধা দেবে—আমিই তখন, বিশ্বাস করিনি—বলেছিলাম আমার দিদিভাইকে আমি জানি সে আমার জন্যে পারে না এমন কিছু দুনিয়ায় নেই। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আমি ভুল করেছিলাম—

মান্নু শোন—তুই—তুই জানিস না—ও তোকে প্রতারণা করেছে—ও ভালবাসতে জানে না—কোনদিন কাউকে ভালবাসতে পারে না—

সর তুমি আমার পথ থেকে—মানসী বলে, আমি জানি ও প্রতারণা করেনি—ও আমাকে ভালবাসে—

প্রতারণা করেনি ?

না—

কিন্তু জানিস তুই ও বিবাহিত—

বিবাহিত !

হঠাৎ যেন কথাটা শুনে থমকে দাঁড়ায় এতক্ষণে মানসী প্রথম।

হ্যাঁ। বিবাহিত।

না, এ আমি বিশ্বাস করি না।

বিশ্বাস কর সত্যি বলছি—he is married—

না—তা হলে তার মা ভাইবোনেরা জানত—

তারা জানে না—তাদের ও জানতে দেয়নি কোনদিন—সত্যিই শিশিরাংশু বিবাহিত—আর তার সেই স্ত্রী এখনো বেঁচে—

সেই স্ত্রী—

হ্যাঁ—নাম তার শর্মিলা আর এই শহরেই সে আছে—আমি তোকে ঠিকানা দেব তুই খোঁজ করে দেখ নিজে বিশ্বাস না করিস আমার কথায়—

সত্যি—সত্যি বলছ দিদিভাই—

মানসীর কণ্ঠে এতক্ষণে বুঝি সংশয়ের সুর।

হ্যাঁ—সত্যিই বলছি—ও বিবাহিত—তোকে মিথ্যা বলেছে—প্রতারণা করেছে—

মানসী ততক্ষণে বসে পড়েছে।

আর সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। দু'হাতে মুখ ঢাকে।

কুন্তী এগিয়ে আসে মানসীর পাশে—

গভীর স্নেহে ওর মাথায় একখানি হাত রেখে বলে, মান্নু—আমি জানি—it is really shocking—প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছিস তুই, ভুলে

যা তাকে—তাছাড়া তুই জানিস না—এ বিয়ে যদি হতও কোনদিন তুই সুখী হতে পারতিস না। একটা নীচ—স্বার্থপর জঘন্য চরিত্রের মানুষ ও—

কান্নায় ভেঙে পড়ে মানসী হঠাৎ ঐ সময় কুন্তীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে, কিন্তু আমার যে আর অন্য কোন উপায় নেই দিদিভাই—

মানু—অস্পষ্ট কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে কুন্তী।

হ্যাঁ, দিদিভাই—অন্য কোন পথ নেই—

কুন্তী যেন পাথর হয়ে গিয়েছে হঠাৎ।

তার সমস্ত বোধশক্তি—সমস্ত চেতনা যেন হিম হয়ে গিয়েছে।

নির্বাক নিস্পন্দ কুন্তী কেবল বোনকে বুকের মধ্যে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

দু'চোখের অশ্রুর ধারা তার গণ্ড ও চিবুক প্লাবিত করে দিচ্ছে।

॥ বারো ॥

কতক্ষণ—কতক্ষণ যে তারপরও অমনি করে কুন্তী পাথর হয়ে মানসীকে বুকের মধ্যে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল নিজেও বুঝি জানে না।

হঠাৎ একসময় তারপর মানসীই ডাকে, দিদিভাই—

কি রে?

আমার যে আর কোন পথ নেই—

তুই ঘরে যা—ভাবিস না কিছু—যা—

দিদিভাই—

যা, ঘরে যা—অনেক রাত হয়েছে—

মানসী ঘর থেকে বের হয়ে গেল ক্লান্ত শিথিল পায়ে।

আর হঠাৎই ঐ মুহূর্তে প্রস্থানরত ছোট বোনটির দেহের দিকে তাকিয়ে কুন্তীর মনে হল—অন্ধ সে—এত দিন কেন তার চোখে পড়ে-নি—ওর চোখের কোল—ওর চলার ভঙ্গি—

কিন্তু এখন ও কি করবে—

সেই শিশিরাংশুর সামনে গিয়ে হাত পেতে তাকে দাঁড়াতে হবে।

তাই—তাই শিশিরাংশু অমনি করে কথাগুলো তাকে বলতে পেরেছিল।

কিন্তু কবে—কবে ঘটলো ব্যাপারটা—

ইতিমধ্যে শয়তানটা মানসীর মনকে জয় করে নিয়েছে—

উঃ কি নির্বোধ মানসীটা—একটা হীন চরিত্র শয়তানের হাতে এমনি করে সে নিজেকে কেমন করে সমর্পণ করল।

কিন্তু সে তো পরের কথা—মানসীকে আজ তাকে যে বাঁচাতে হবে।

তার মুখের আশ্বাস পেয়েই মানসী নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে গিয়েছে। কিন্তু কেমন করে—কেমন করে সে বাঁচাবে মানসীকে এ অপমানের হাত থেকে—

বাবা—কোথায় তুমি বাবা—

কোথায় গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ।

তোমার দেওয়া দায়িত্ব বইবার আর যে আমি শক্তি পাচ্ছি না বাবা।

এই কথা যদি ঘুণাক্ষরেও এখন প্রকাশ হয়ে যায়—সারা বাড়ি মুখর হয়ে উঠবে।

ঐ রতিনাথই সর্বাগ্রে চিৎকার করতে শুরু করে দেবেন।

তারপর তার স্ত্রী—

উঃ মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে কুন্তীর।

কি অসহ্য যন্ত্রণা—

সারাটা রাত ঘরের মধ্যে পায়চারি করেছিল কুন্তী।

এবং শুধু সেই রাতই নয় তার পরের আরো দুটো রাত।

কি করবে সে এখন, কি করবে!

মানসী—মানসীর কি ব্যবস্থা করবে।

একমাত্র উপায় বিবাহ।

মানসী ও শিশিরাংশুর বিবাহ।

কুন্তীর মুখের দিকে চেয়ে মানসীও যেন ভয় পেয়ে যায়।

ভয়ে ভয়ে সে আবার দুদিন পরে কুন্তীর সামনে এসে দাঁড়ায়।

পরবর্তীকালে ব্যাপারটা অনেক ভেবেছে কুন্তী—

সেদিন কি সে ভুল করেছিল?

কিন্তু আবার এও মনে হয়েছে আর কিইবা সেদিন সে করতে পারত, আর কিইবা তার করার ছিল।

মানসীকে সেদিন সেই অপমানের হাত থেকে বাঁচাবার তো আর কোন পথই তার সামনে সেদিন খোলা ছিল না।

সামনে তার আর কোন রাস্তাই ছিল না।

হ্যাঁ ঠিক, মাথা পেতে সে সেদিন চরম অপমানকেই মেনে নিয়েছিল।

শুধু মানসীর মুখের দিকে চেয়েই সেদিন কুন্তীকে ঐ অপমান মাথা পেতে নিতে হয়েছিল।

মানসী অতঃপর শুধিয়েছিল, তা হলে কি হবে দিদিভাই—

ভাবিস না, একটা কিছু উপায় হবেই—

আমি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি যে ও বিবাহিত ও তার স্ত্রী বর্তমান—

মানসী—

দিদিভাই?

তুই এক কাজ কর—শিশিরাংশুকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বল।

আমি যাব দিদি—গিয়ে তাকে হোটেল থেকে ডেকে নিকে আসব!

না, ফোন করে দে আসবার জন্য।

কিন্তু মানসী সেদিন কুন্তীর কথা শোনেনি।

দুপুরের দিকে কুন্তীকে কিছু না জানিয়ে চলে গিয়েছিল মানসী।

এবং বিকেলের দিকে যখন সে তার ঘরের মধ্যে বসে আছে গণেশ এসে জানাল, শিশিরাংশুবাবু এসেছেন।

নীচেয় লাইব্রেরী ঘরে বসতে দে গিয়ে, আমি আসছি, কুন্তী বলে।

গণেশ চলে গেল এবং একটু পরে গায়ের কাপড়টা ঠিক করে কুন্তী ঘর থেকে বেরুল।

লাইব্রেরী ঘরের মধ্যে একটা বড় সোফার উপরে গা এলিয়ে দিয়ে সামনের একটা নীচু গোলাকার টেবিলের উপর জুতো সমেত পা দুটো তুলে সিগ্রেট টানছিল শিশিরাংশু।

কুন্তীকে ঘরে ঢুকতে দেখে একটু নড়ে-চড়ে বসল বটে শিশিরাংশু কিন্তু টেবিলের উপর থেকে পা দুটো নামাল না।

এই যে কুন্তী দেবী—হঠাৎ এত জরুরী তলব যে একেবারে বোনটিকে আমার হোটেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন! কঠিন ব্যঙ্গ যেন শিশিরাংশুর কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়ে।

কুন্তী চমকে ওঠে শিশিরাংশুর কথাটা শুনে। বলে, মানসী—

হ্যাঁ, ফেরেনি, আপনার decision-টা শোনবার অপেক্ষায় এখনো আমার হোটেলের ঘরেই বসে আছে—

Decision?

তা বৈকি! এখন বলুন এ অধীনকে স্মরণ করেছেন কেন?

মানসী আমার বোন শিশিরাংশুবাবু, তাই সমস্ত অপমানই আমাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হবে। যাক্ সে কথা—মানসীকে বিয়ে করবার আগে আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই শর্মিলার কি ব্যবস্থা আপনি করছেন?

শর্মিলা সম্পর্কে আপনার কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই কুন্তী দেবী—

আপনার হয়ত নেই কিন্তু আমার আছে—সে যাতে হঠাৎ কোনদিন আবার এসে আমার বোনের জীবনের শান্তি না নষ্ট করে, সে দিকটা—

ভয় নেই—সে আসবে না, আমার মনে হয় কিছু টাকা তাকে দিয়ে দিলে—এই ধরুন হাজার দশেক—

কে দেবে?

কেন, আপনিই দেবেন—

আমি—

হ্যাঁ—মানসীর জীবনের সুখ-দুঃখটা আপনি না দেখলে কে দেখবে বলুন ?

কয়েকটা মুহূর্ত যেন বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কুন্তী ঐ মানুষটার দিকে। লোকটা কি শয়তান! না, শয়তানেরও হৃদয় বলে একটা বস্তু আছে।

কিন্তু ঐ মানুষটার তাও বুঝি নেই।

অপরিসীম ঘৃণায় সর্বাঙ্গ ঘিনঘিন করতে থাকে কুন্তীর। আশ্চর্য, এই জঘন্য, নীচ প্রকৃতির মানুষটাকে এতদিন মনে মনে এতখানি ভাল-বেসেছিল কি করে ?

অমন চমৎকার একটা মুখোস মানুষটা মুখে এঁটে রেখেছিল একটি-বারও বুঝতে পারেনি কুন্তী।

বেশ, তাই হবে, কুন্তী ধীরে ধীরে এক সময় বলে, কিন্তু তাতে করেই যে ব্যাপারটা চিরদিনের মত মিটে যাবে—তাতে আপনি নিশ্চিত হলেন কি করে ?

নিশ্চিত—মৃদু হাসে শিশিরাংশু—দশ হাজার দূরে থাক, জীবনে কখনো একত্রে একশ টাকাও চোখে দেখেনি। তাছাড়া ও সব মেয়েদের চরিত্র তো আমার জানা আছে, যারা দেহ আর যৌবনের ফাঁদ পেতে পুরুষকে ঘায়েল করে—

কিন্তু শিশিরাংশু কথাটা শেষ করতে পারে না—আগেই তাকে তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার করে থামিয়ে দেয় কুন্তী—থামুন—থামুন—

। তের ।

কুন্তীর আকস্মিক চিৎকারে শিশিরাংশু থেমে গিয়েছিল।

থেমে গিয়ে কুন্তীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

থামুন—আপনি আর ঐ কথাগুলো নাই বা উচ্চারণ করলেন মুখে।

—বিশেষ করে আমার সামনে—তারপর একটু থেমে নিজেকে যেন অনেকটা সংযত করে প্রশ্ন করে, আপনি তার সম্পর্কে তা হলে কি ব্যবস্থা করবেন সেটাই বলুন।

শুনুন কুন্তী দেবী—আমার বক্তব্য হচ্ছে শর্মিলা সম্পর্কে কি করব না করব সেটা যখন একান্তভাবে আমারই ব্যাপার, আমিই না হয় ভাবলাম—আপনি সে ব্যাপারে অতটা মাথা নাই বা ঘামালেন—

প্রয়োজন বলেই আমাকে মাথা ঘামাতে হচ্ছে—মানসী আমার একমাত্র বোন—

আমি বিয়ে করলে সে আমার স্ত্রী হবে—

তা হবে, কিন্তু বিয়ে করবার পর।

বেশ—তার আগে আপনি আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন—

প্রশ্ন—

হ্যাঁ—

কিসের প্রশ্ন ?

মানে আপনাদের সম্পত্তির ব্যাপারটা—

সম্পত্তির—

হ্যাঁ—ডাঃ চৌধুরীর সম্পত্তির কি ব্যবস্থা হবে, যদিও আপনার গুণধর শকুনি কাকাটি এসে দরজা আগলে বসেছেন তা হলেও আমি জানি, তার কিছু করবার শক্তি নেই। সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র মালিক তো বটেই আবার আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ব্যাঙ্ক ট্র্যাঙ্কজ্যাকশনের অধিকারী আপনার বাবার উইল অনুযায়ী—

কুন্তী চেয়েছিল শিশিরাংশুর মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে—

আশ্চর্য ! মানুষটা সে খবরও রেখেছে।

শিশিরাংশু বলে, চেয়ে আছেন কি আমার মুখের দিকে, সব আমি জানি—খবর রাখি—তাই বলছিলাম, মানসীসম্পর্কেকি ব্যবস্থাকরবেন ? সে যখন আপনারই মুখাপেক্ষী—

কুন্তীর একবার ইচ্ছা হয়েছিল চিৎকার করে লোকটার মুখের উপরে বলে দেয়, এক কপর্দকও দেব না তাকে—

চুপ করে থাকে কুন্তী।

চুপ করে থাকলেও চলবে না কুন্তী দেবী।

উঃ, শয়তানটা জানে যে সে আজ ভাল করে কুন্তীকে মুঠোর মধ্যে পুরেছে—ইচ্ছামত তাকে সে যে পথে চলতে বলবে কুন্তীর সেই পথেই যাওয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

রাগ করেও কোন লাভ নেই।

সে আজ মানসীর জন্য সব কিছু মেনে নিতে বাধ্য।

ধীরে ধীরে তাই বলে, সেজন্য আপনাকে ভাবতে হবে না।

হেসে ওঠে শিশিরাংশু, তাই কি একটা কথার কথা হল কুন্তী দেবী, কথায় বলে পর হস্তগত ধন, তার একটা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত কি—

অর্ধেক সে পাবে বৈকি—

আর ব্যাঙ্কের টাকা?

তাও পাবে।

কত আছে ব্যাঙ্কে?

যা আছে তার অর্ধক পাবে সে—এখন বিয়েটা কবে হবে বলুন-‐

বিয়ে!

হ্যাঁ, কবে হবে তাই বলুন।

ব্যস্ত কি, সম্পত্তির সব ফয়শালা হয়ে যাক, তারপর—

আমি তো বললাম সব করে দেব।

অবিশ্যি আপনার কথাকে আমি honour করি, কারণ আপনি কথার খেলাপ করবেন না অন্তত কুন্তী দেবী আমি তা জানি—কিন্তু—

কি—

আরো একটা কথা আছে এর মধ্যে।

কি কথা?

মানসীর, মানে, মানসীর শরীরের বর্তমান অবস্থাটা নিশ্চয়ই আপনার অজ্ঞাত নয় কুন্তী দেবী।

লজ্জায় ঘৃণায় কুন্তী যেন আর তাকাতে পারে না, মাথাটা নীচু করে।

বলছিলাম কি এই অবস্থায় বিয়েটা করা কি ভাল দেখাবে?

লোকটা বলে কি? চকিতে মুখ তুলে তাকায় কুন্তী—

এ—এ আপনি কি বলছেন শিশিরাংশুবাবু!

ঠিক বলেছি—এ অবস্থায় বোধ হয় বিয়ে করাটা উচিত হবে না। মানে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কুন্তী দেবী, বিয়ের মাস ৬/৭-এর মধ্যেই বাচ্চা যখন হবে তখন আমার চাইতে কেলেঙ্কারীটা তারই কি বেশী হবে না—তাই বলছিলাম—

কুন্তী অবাক বিস্ময়ে যেন পাথর হয়ে মানুষটার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

শিশিরাংশু বলে, তাই বলছিলাম—সবটাই সুষ্ঠু, সুন্দর ও স্বাভাবিক হওয়াই ভাল নয় কি। বিশেষ করে ডাঃ সতীনাথ চৌধুরীর মেয়ে—একটা আভিজাত্যের কৌলিন্য আছে, যদি কোন একটা ব্যবস্থা করতে পারেন, আপনার পক্ষে তো সেটা তেমন অসুবিধাও কিছু হবে না, বাবা ডাক্তার ছিলেন, অনেক ডাক্তারদের সঙ্গেই তো আপনাদের জানাশোনা আছে—

শিশিরাংশুর জঘন্য কুৎসিত স্পষ্ট ইঙ্গিতটা যেন কুন্তীকে একেবারে বোবা করে দেয়।

মানুষটা এত জঘন্য—এত কুৎসিত—এত নীচ—এত নোংরা!

মুখোসটা খুলে গিয়েছে শিশিরাংশুর, ভয়াবহ কুৎসিত ক্লেদাক্ত একটা সরীসৃপ যেন—মানুষ নয়—

শিশিরাংশু আবার বলে, আপনি বুদ্ধিমতী অধিক বলা বাহুল্য।

অকস্মাৎ যেন অগ্ন্যুৎপাত ঘটলো।

ফেটে পড়ল যেন কুন্তী, যান—যান এখান থেকে বলছি—মনে করব এর চাইতে আমার বোন মরে গেছে, কিংবা আমিই ওর গলা টিপে মেরে ফেলব—

কুন্তী ঘৃণায় আক্রোশে অপমান-জ্বালায় যেন থর থর করে কাঁপতে থাকে।

কথাগুলো শেষ করতে পারে না—কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায় অবরুদ্ধ অশ্রুতে বুঝি।

শিশিরাংশু শান্ত কণ্ঠে বলে, মিথ্যে আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন কুন্তী দেবী, কলঙ্কর কথাটা আপনি আদৌ ভাবছেন না—পয়সা আপনাদের অনেক আছে মানি কিন্তু ভাববেন না সেই পয়সা দিয়ে সারাটা তুনিয়ার মুখই বন্ধ করতে পারবেন। আর কলঙ্ক—বিশেষ করে মেয়েদের এমনি জিনিস যে বিষাক্ত ঘায়ের মত শুকিয়ে গেলেও কুৎসিত দাগগুলো বাকী জীবনটায় থেকেই যায়—কোনদিন মোছে না—

আপনি যাবেন কি না—যান—

বেশ, যাচ্ছি, তবে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন—কথাটা আমার কত সত্য, আর এও জানি, ফিরে আবার আমার কাছেই আসতে হবে—আজই হোক বা কালই হোক—of course I will wait for you—অপেক্ষা করে থাকব হোটেলেই আমি—আচ্ছা চলি, Bye—Bye—

শিশিরাংশু অতঃপর ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কুন্তী কিন্তু বসেই রইল।

পায়ের তলা থেকে সমস্ত মাটিটা তখন তার সরে যাচ্ছে।

এ মানসী কি করল!

কোন ভয়াবহ সর্বনাশের মধ্যে এমনিকরে ঝাঁপিয়ে পড়তে চলেছে!

কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে পড়ে মানসীর অসহায় অবস্থার কথাটা।

কি করবে, সে এখন কি করবে।

কি সে করতে পারে।

একদিকে মানসীর সব কিছু মান অপমান লজ্জা—পরিচয়, অন্য দিকে ঘৃণ্যতম পরাজয়।

পাগলের মতই তুটো দিন ছটফট করে বেড়াল কুন্তী।

কারো কাছে যদি একটু পরামর্শ পেত—কিন্তু এক কান থেকে দশ কান হয়ে যাবে হয়ত তখন ব্যাপারটা। আর তখন সমস্ত আড়াল ভেঙে গিয়ে চরম অপমান আর লজ্জা তাদের গ্রাস করবে।

না, না, তা তো সম্ভব নয়।

তা ছাড়া মানসীকে সে কথা দিয়েছে—

একদিন ছুদিন করে আরো কটা দিন গেল—মানসী আজকাল এক মুহূর্তও বলতে গেলে বাড়ি থাকে না—যখন-তখন শিশিরাংশুর হোটেলে চলে যায়।

সত্যি, আর বুঝি ভাবতে পারে না কুন্তী। আর ভেবেই বা কি করবে—মনে মনে স্থির করে কালই সে শিশিরাংশুর কাছে যাবে। বলবে, একটা উপায় সে ভেবেছে—

কিন্তু তার আগে সম্পত্তির একটা বিলি-ব্যবস্থা করা দরকার।

শিশিরাংশু নচেৎ হয়ত বেঁকে বসবে।

পরের দিন সকালেই তাই সে সলিসিটারের কাছে গেল, তাকে সব বললে, সম্পত্তির একটা পাকা ব্যবস্থা করতে চায় সে।

বলুন, কি ব্যবস্থা করতে চান? সলিসিটার শুধায়।

ব্যাঙ্কের টাকা সামান্য কিছু রেখে সব মানসীর নামে ট্রান্সফার করে দেবার ব্যবস্থা করুন, আর সব অস্থাবর সম্পত্তি ও কারখানা, তার অর্ধেক অংশের শেয়ার মানসী পাবে এবং সেই শেয়ার থেকে মাসে মাসে একটা ৫০০ শত টাকার মত মাসোহারা দেওয়া হবে।

কখন থেকে ঐ ব্যবস্থা চালু করতে চান আপনি?

ওর বিয়ের পর থেকে—

বিয়ে কি ওর স্থির হয়েছে নাকি?

না এখনো হয়নি, তবে—

তবে—

আমি সব ব্যবস্থা আগেই করে দিতে চাই।

বেশ, তাই হবে।

তা হলে আপনি একটা ড্রাফট্ করে যত শীঘ্র পারেন আমার কাছে নিয়ে আসবেন।

আসব।

আরো দিন তিনেক বাদে একটা ড্রাফটের টাইপ কপি নিয়ে কুন্তী শিশিরাংশুর হোটেলে গিয়ে হাজির হল।

কি সৌভাগ্য, আসুন, কুন্তী দেবী।

শিশিরাংশু স্বাগত সম্ভাষণ জানায়।

আমি জানতাম অবিশ্যি আপনি আসবেন, যাক, এখন বলুন কি বলবেন? মানসীর যা ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম—

না।

না?

না, তা হবে না।

হবে না বুঝি?

না, যে শিশু এসেছে তাকে আমি এভাবে হত্যা করতে দেব না, বিয়ের পর আপনারা দূরে কোথাও চলে যান।

তারপর?

সন্তান হবার পর আমাকে খবর দিলে, আমি সে সন্তানের ব্যবস্থা করব।

কি ব্যবস্থাটা করবেন জানতে পারি কি?

আমার কাছে সে সন্তানকে আমি নিয়ে আসব—

An absurd proposal—

শিশিরাংশুবাবু, আপনাকে আমি নগদ দশ হাজার টাকা আলাদা দেব—মানসীর প্রাপ্য সম্পত্তি বাদেও এবং সে সন্তানকে আমি নিয়ে আসব, সে কথাও দিচ্ছি—

But if you don't keep your promise—আপনার কথা যদি না রাখেন—

আমাকে আপনি বিশ্বাস করেন না?

করি—

তবে?

বেশ, তবে তাই হবে—

এখন বলুন, কবে বিয়েটা হবে?

যেদিন খুশি হতে পারে—

আপনি তাড়াতাড়ি দিন ঠিক করুন একটা, আর এই নিন সম্পত্তির

ড্রাফট্—পড়ে দেখবেন—কাল আমি আবার আসব।

কথাটা বলে কুন্তী আর দাঁড়ায় না—উঠে দাঁড়ায় যাবার জন্য এবং দরজার দিকে দু পা এগুতেই মানসীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়।

মানসী ঘরে ঢুকছিল।

মানসীও কুন্তীকে ঘরে দেখে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

কিন্তু কুন্তী দাঁড়ায় না—এমন কি ফিরে মানসীর দিকে তাকায় না পর্যন্ত। ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

এস—মানসী—বস।

দিদিভাই এসেছিল—

হ্যাঁ—আমি তোমাকে বলিনি—she must come, আসবে সে, তাকে আসতে হবেই—

মানসী শিশিরাংশুর কথার কোন জবাব দেয় না।

ধীরে ধীরে সোফাটার ওপর এসে বসে!

হাতে কিসের কাগজ ওটা? মানসী শুধায়।

ও কিছু না। এমনি একটা কাগজ—কাগজটা আড়াল করে ফেলে শিশিরাংশু।

শিশির—

বল—

আমাকে তুমি ক্ষমা কর শিশির, ও আমি পারব না—মা হয়ে নিজের সন্তানকে—তাছাড়া সে তো কোন পাপ করেনি, আর আমরা যখন বিয়েই করছি—

আচ্ছা, আচ্ছা হবে, তোমার যখন এতই অনিচ্ছা—সেজন্য তোমাকে অত ভাবতে হবে না—

সত্যি, সত্যি বলছ শিশির।

হ্যাঁ, তবে—

কি তবে?

বিয়ের পরই এখান থেকে আমরা দূরে কোথায়ও চলে যাব।

সে খুব ভাল হবে—মানসী বলে।

তারপর তোমার বাচ্চা হয়ে গেলে ফিরে আসা যাবে আরো কিছু-দিন পরে, তখন আর কারো কিছু মনেও হবে না।

উঃ, ইউ আর সো নাইস শিশির, আনন্দে আত্মহারা হয়ে মানসী শিশিরাংশুকে জাপটে ধরে।

আরো দিন সাতেক পরে রেজেস্ট্রি করে বিয়ে হয়ে গেল!

এবং বিয়ে যেদিন হল—কুন্তী সকলকে নিমন্ত্রণ করে হোটেলে একটা ডিনার দিল।

বললে যে, মার অসুখ তাই বাড়িতে কোন কিছু করা হল না।

রতিনাথ কেবল বলতে লাগলেন, একটা কায়স্থর সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিলি শেষ পর্যন্ত তুই মা—

কুন্তী বলে, ওসব আজকাল আর কেউ মানে না কাকা—

ডিনার তখনো শেষ হয়নি, কুন্তী একপাশে শিশিরাংশুকে ডেকে এনে তার হাতে একটা ভারী খাম তুলে দিল।

শিশিরাংশু শুধায়, কি এটা—

এতে নগদ দশ হাজার টাকা, তোমাদের কাল সকালের প্লেনের দুটো টিকিট আর সম্পত্তির দলিল—কাল সকালেই তোমরা দিল্লী চলে যাবে—

দিল্লী।

হ্যাঁ, তারপর সেখান থেকে যেখানে যেতে চাও যেও, আমাকে একটা চিঠিতে জানিও শুধু সন্তান হবার পর—আমি গিয়ে তাকে নিয়ে আসব—

কুন্তী কথাগুলো ব'লে আর দাঁড়াল না—বাড়ি থেকে ফোন এসেছিল, মার অবস্থা হঠাৎখারাপ হয়েছে, সে সোজাবাড়ি চলে গেল।

বাড়িতে পৌঁছে দুটো দুঃসংবাদ পর পর পেল।

মার মৃত্যু হয়েছে কয়েক মিনিট আগে এবং বনমালী কাকার খোঁজ করতে গিয়ে জানতে পারল আগের দিনই নাকি বনমালী সরকার কোথায় যে চলে গেছেন কেউ জানে না।

। চৌদ্দ ।

কুন্তী যেন অকূল সাগরে পড়ে।

মায়ের মৃত্যু—বনমালী কাকা নেই—মানসী ঐভাবে তাকে চরম আঘাত দিয়েছে—দিশেহারা সে, কি করবে ভেবে পায় না।

অনন্যোপায় হয়েই যেন কুন্তী রতিনাথের হাতে সব কিছু দেখা-শোনার ভার তুলে দিল।

আর সে পারছে না।

সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আর সে পারছে না। সে দিশেহারা—ক্লান্ত—অবসন্ন।

মানুষ এক এক সময় এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যে তখন নিজেকে প্রবহমান ঘটনাবর্তের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন পথই বুঝি সে খুঁজে পায় না।

ভাল-মন্দ লাভ খতিয়ানটা পর্যন্ত তখন আর তার মনে স্থান পায় না।

কুন্তীর সেদিন ঠিক তেমনি অবস্থা।

যে মাটিতে পা রেখে সে দাঁড়াবার স্বপ্ন দেখছিল সেই মাটিটাই শুধু পায়ের নীচ থেকে সরে গিয়েছে তাই নয়—মনের সব চাইতে বড় বিশ্বাসের জায়গাটা হঠাৎ যেন জনশূন্য—ফাঁকা হয়ে গিয়েছে।

আশা নেই, ভবিষ্যৎ নেই—কেবল ব্যর্থতা-রিক্ততার একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস যেন সমস্ত মনটাকে বিকল বিষণ্ণ করে তুলেছে।

মনের ঠিক ঐ অবস্থায় আর কিইবা সে করতে পারত।

তখন সমস্ত কিছুই তো তার কাছে দুঃসহ।

লেখাপড়া করে শিশির ও মানসীর একটা মাসোহারার ব্যবস্থা করে তো দিয়েছিলই, ব্যাঙ্কে যা নগদ ছিল তার সবটাই ওদের নামে ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার করে দিয়েছিল।

সে তার প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল।

কুন্তী স্বর্ণেন্দুকে বলেছিল, এ ছাড়া আর কি উপায় ছিল বলুন?

কিন্তু আপনি যা ভাবছেন—সর্বনাশকে ঠেকিয়ে রাখবেন—

না স্বর্ণেন্দুবাবু, সর্বনাশকে কি ঠেকান যায়, না আজ পর্যন্ত কেউ তা পেরেছে— আপনি কি বলবেন আমি জানি, মানসী সুখী হবে না কোন দিন, হতে পারে না। মিথ্যার উপরে কোন দিন কোন সত্য দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না তা আমিও যে জানি না তা নয়—তবু আমার দায়িত্ব-টুকু তো আমি পালন করলাম—এটুকু সান্ত্বনাও তো অন্তত্র আমার থাকল—ভাল কথা, শর্মিলার কোন খোঁজ আর আপনি করতে পেরে-ছিলেন ?

হ্যাঁ—

দেখা হয়েছিল আপনার সঙ্গে—

হয়েছিল—দেখলাম সব সে জানে—

জানে !

হ্যাঁ—আপনার সঙ্গে দেখা করার কথা বলতে সে বললে—কুন্তী দেবীকে বলবেন—পুরাতন একটা ভুলকে আর আমি ঘেঁটে নিজের গায়ে কাদা ছিটাব না। শিশিরাংশু আমার মন থেকে মুছে গিয়েছে—সে আজ আমার কাছে মৃত—

কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে কুন্তী বলে, কি যেন চাকরি করে সে বলেছিলেন ?

হ্যাঁ সামান্য চাকরি—একটা মার্চেন্ট অফিসে টাইপিস্টের চাকরি, মাইনে একশত কুড়ি টাকা মত পায়—বিধবা মা এখনো বেঁচে আছে। দুজনে দমদমের ওদিকে একটা ছোট বাসা ভাড়া করে থাকে।

আমি যে ভেবেছিলাম, কিছু—

না কুন্তী দেবী, ও চেষ্টা বোধ হয় না করাই ভাল।

কেন ?

ও নেবে না।

স্বর্ণেন্দুকে শেষ পর্যন্ত চাকরিটা ছাড়তে দেয়নি কুন্তী।

মানসী ও শিশিরাংশুর বিয়ের পর দিন যখন সব কিছুর ব্যবস্থা সে

করে ফেলেছে তখন সে এক সময় স্বর্ণেন্দুর বাসায় গিয়ে হাজির হয়েছিল।

ভবানীপুরে হরিশ মুখার্জী রোডের একটা সরু গলির মধ্যে স্বর্ণেন্দুর বাসা।

দোতলায় খান তিনেক ঘর নিয়ে দুটি প্রাণীর নির্ঝঞ্ঝাট সংসার।

মা ও ছেলে। স্বর্ণেন্দু ও তার মা।

ভোর বেলাই গিয়ে হাজির হয়েছিল কুন্তী স্বর্ণেন্দুর ওখানে।

স্বর্ণেন্দুর মা-ই বাসায় ছিলেন—স্বর্ণেন্দু বাসায় ছিল না।

পরবর্তীকালে প্রায়ই ভেবেছে কুন্তী—ভাগ্যে সেদিন স্বর্ণেন্দুর ওখানে গিয়েছিল সে নচেৎ অতবড় সত্যটা কোনদিনই সে জানতে পারত না।

জীবনটা যে শুধু অন্ধকারই নয় আলোও আছে, এ কথাটা তো কোন দিনই তার আর জানা হত না, তার জীবনের কোন সান্ত্বনাই তো আর থাকত না—

স্বর্ণেন্দুর মা তো কোনদিন ইতিপূর্বে দেখেননি কুন্তীকে—জিজ্ঞাসা করেন—তুমি—

আপনি বোধ হয় স্বর্ণেন্দুবাবুর মা!

হ্যাঁ—

আপনি আমায় চিনবেন না—আমি কুন্তী, স্বর্ণেন্দুবাবু নেই?

একটু বাইরে গিয়েছে, এখুনি ফিরবে—এস মা—ঘরে এসে বস।

ভদ্রমহিলা কুন্তীকে ঘরে এনে বসান এবং বার বারই যেন কুন্তীর মুখের দিকে তাকান।

কুন্তী বিব্রত বোধ করে।

তোমার মুখটা এত চেনা চেনা কেন মনে হচ্ছে বল তো মা—কোথায় যেন তোমায় দেখেছি মনে হচ্ছে।

হয়ত রাস্তা-ঘাটে কখনো দেখে থাকবেন—কুন্তী ইতস্তত: করে বলে।

না মা, রাস্তায় তো আমি বড় একটা বের হই না—তুমি বোস, ও

আবার তাড়াতাড়ি কোথায় যেন বেরুবে, রান্নাটা চাপিয়েছি—

স্বর্ণেন্দুর মা চলে গেলেন।

কুন্তী ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখে, মাঝারি আকারের ঘরখানি কিন্তু ঘরের প্রতিটি বস্তুতে এমন পরিচ্ছন্ন আর্টিস্টিক।একটা রুচি-বোধের পরিচয় ছড়ানো আছে যে কুন্তী মুগ্ধ হয়ে যায়।

একটি সিঙ্গল বেডে পরিচ্ছন্ন বিছানা—মোরাদাবাদী একটা বেড কভারে ঢাকা।

একটি বুক-সেল্ফে নানা বই।

পাশের ঘরে নজর পড়ে কুন্তীর মধ্যবর্তী দরজাপথে।

ঘরের দেওয়ালে সর্বত্র—হাতে আঁকা নানা ধরনের ছবি, কৌতূহলী কুন্তী পায়ে পায়ে এক সময় পাশের ছোট ঘরটায় গিয়ে প্রবেশ করে।

ষ্টুডিও—

স্বর্ণেন্দুর তা হলে ছবি আঁকার সখ আছে—শুধু সখ নয়, ছবিগুলো দেখতে দেখতে কুন্তীর মনে হয় ঐ ব্যাপারে স্বর্ণেন্দু রীতিমতই পারদর্শী।

হঠাৎ ঈজেলের উপরে অর্ধসমাপ্ত একখানা ছবির প্রতি নজর পড়তেই চমকে ওঠে কুন্তী, কার—কার ছবি—মনে হচ্ছে যেন সেই—

ছবিটির নীচে ছোট করে লেখা—গোপন স্বপ্ন।

অকস্মাৎ—অকস্মাৎই যেন মনের পাতায় কুন্তীর একটা আলোর ঝাপ্‌টা এসে লাগে।

কিন্তু সেখানে ঐ ছবির সামনে ঐ ঘরের মধ্যে যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে একাকী সাহস হয় না—তাড়াতাড়ি এ ঘরে চলে আসে কুন্তী।

আজ মনে পড়ে নতুন করে স্বর্ণেন্দুর দুটি চোখের দৃষ্টি—

সত্যিই তো, সে দৃষ্টিই তো তাকে বলেছে—সব কথা, কতদিন—অন্ধ সে, তাই দেখতে পায়নি—

কাজের জন্য দিনের পর দিন এসেছে তাদের বাড়িতে—কারখানা সম্পর্কে কথাবার্তা হয়েছে—সহজে তাকায়নি স্বর্ণেন্দু তার মুখের দিকে।

মুখ নীচু করেই কথাবার্তা বলেছে কিন্তু যখন চোখ তুলে তার দিকে

তাকিয়েছে—

দৃষ্টি পড়েনি—কোনদিন দৃষ্টি পড়েনি তার, কেন পড়েনি—

বাইরে পদশব্দ পাওয়া গেল।

পরমুহূর্তেই স্বর্ণেন্দু এসে ঘরে ঢুকল।

আপনি—

কেন আসতে পারি না! বলে কুন্তী।

না, না—তা কেন—কিন্তু—

স্বর্ণেন্দুবাবু—

বলুন!

আজ কিন্তু একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি—

অনুরোধ।

হ্যাঁ—খালি হাতে ফিরিয়ে দেবেন না তো?

স্বর্ণেন্দু মৃদু হাসে, তারপর বলে, বলুন—

আপনার কাজ ছাড়া চলবে না—

কিন্তু—

বললাম তো, আমার অনুরোধ—রাখবেন না আমার অনুরোধটুকু?

স্বর্ণেন্দু চুপ করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ডাঃ ভাদুড়ীকেও আমি অনুরোধ করেছি, তিনিও ছাড়বেন না চাকরি বলেছেন, তাছাড়া যে কারণে আপনাদের অসম্মান হয়েছিল সে কারণ তো আর থাকল না।

কিন্তু—

না স্বর্ণেন্দুবাবু, আপনি না করতে পারবেন না। তাছাড়া আমার সব চাইতে বড় আশ্রয়টাই যে আমি হারিয়েছি আজ—

কুন্তী দেবী—

হ্যাঁ, বনমালী কাকা চলে গেছেন।

সে কি!

হ্যাঁ স্বর্ণেন্দুবাবু—কেউ আজ আর আমার পাশে নেই, আরো একটা কথা। আপনাকে তো বলিনি—

কি ?

বাড়ি ঘরদোর ও অন্যান্য ব্যাপার তো সবই এতদিন বনমালী কাকা দেখছিলেন, এখন থেকে আমার কাকা দেখবেন।

কিন্তু—

জানি কি বলবেন আপনি, কিন্তু তাকেই বা আর কতদিন ঠেকিয়ে রাখি বলুন। যে সর্বক্ষণ দু'হাত বাড়িয়ে রয়েছে, তাছাড়া একটা সামান্য মানুষ আমি, কত যুদ্ধ করব একা একা বলুন তো—

বেশ, আজই আমি অফিসে যাব—

ঠিক তো—

হ্যাঁ—

আঃ, আপনি আমায় বাঁচালেন স্বর্ণেন্দুবাবু—আমি—আমি কি যে বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব—

ঐ সময় স্বর্ণেন্দুর মা মমতাময়ী একটি কাঁচের ডিসে কিছু হালুয়া ও এক কাপ চা নিয়ে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন।

এ কি, আপনি আবার কষ্ট করতে গেলেন কেন মা ? তাড়াতাড়ি বলে ওঠে কুন্তী।

কষ্ট আবার কি মা—সামান্য এক কাপ চা—

স্বর্ণেন্দু বলে, কিন্তু মা, আমাদের বাড়ির ঐ চা কি উনি খেতে পারবেন ?

কেন ? মমতাময়ী ছেলের মুখের দিকে তাকান।

মমতাময়ী সত্যি কথা বলতে কি ছেলের কথাটা ঠিক বুঝতে পারেন নি, কারণ অতি সাধারণ বেশে কুন্তী এসেছিল।

সাধারণ সরু কালো পাড় একটি তাঁতের শাড়ি ও সাদামাটা একটি আদ্দির ব্লাউজ পরনে—হাতে একগাছি করে সরু সোনার চুড়ি—

দোষ নেই মমতাময়ীর, ঐ সামান্য বেশে কুন্তীকে তিনি বুঝবেন কি করে—

সামান্য বেশে দেখে তুমি চিনতে পারনি মা, কিন্তু উনি কার মেয়ে জান ? শহরের একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সতীনাথ চৌধুরীর মেয়ে—

কুন্তী অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছিল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মমতাময়ীর হাত থেকে প্লেটটা নিয়ে বলে, কি যে বলেন স্বর্ণেন্দুবাবু আপনি—দিন মা—তাছাড়া সত্যিই আমার চায়ের পিপাসা পেয়েছে—

মমতাময়ী ততক্ষণে নামটা শুনে চিনতে পেরেছেন কুন্তীকে। বলেন, মানে যে ঔষধের কোম্পানীতে তুই চাকরি করতিস—

হ্যাঁ মা, সেই কোম্পানীরই ম্যানেজিং ডাইরেকটার—খোদ মালিক—

স্বর্ণেন্দুবাবু, আপনি যদি এমনি করে আমাকে লজ্জা দেন—তারপরই মমতাময়ীর দিকে তাকিয়ে বলে কুন্তী, আচ্ছা মা—আপনিই বলুন তো —সেই কোম্পানীর উনিও তো অ্যাসেসটেণ্ট ম্যানেজার—উনিই বা কিসে কম—কিন্তু মা, ওঁকে চা দিলেন না?

এই যে আনছি—

মমতাময়ী ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

নির্মল কৌতুকে ও আনন্দে সকালটা যেন প্রসন্ন হয়ে উঠল।

এবং কুন্তী স্বর্ণেন্দুর কাছ থেকে যখন বিদায় নিয়ে বের হয়ে এল তখন মনটা তার কানায় কানায় ভরে উঠেছে যেন।

দুঃখে ও জ্বালার অনেক বাষ্প কয়েকদিন ধরে মনটা ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল—মনটা যেন অনেকটা হাল্‌কা হয়ে যায়।

কুন্তীর বেশ মনে আছে—

শিশিরাংশু ও মানসীর একদিন বিয়ে হয়ে গেল গেল। এবং ওদের বিয়ের পরদিনই—নর্মদার মৃত্যু হল।

নর্মদার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সর্বাগ্রে স্বর্ণেন্দুই ছুটে এসেছিল—এসে কুন্তীর পাশে দাঁড়িয়েছিল।

এবং স্বর্ণেন্দু যদি কুন্তীর সেই চরম দুঃখের মুহূর্তে অমন করে সেদিন তার পাশটিতে এসে না দাঁড়াত কুন্তী আজও ভেবে পায় না সে কি করত।

বনমালী কাকা নেই—রতিনাথ কেবল নিরর্থক চেঁচামেচি করছে। রতিনাথের স্ত্রী অনাবশ্যক গলায় জোর দিয়ে চিৎকার করে কাঁদছে—

মানসীও বাড়িতে নেই।

কুন্তী যে কি করবে ভেবে পায় না।

কেমন যেন বিহ্বল বিভ্রান্ত হয়ে মার মৃত্যুশয্যার পাশটিতে বসে ছিল। কাঁদতেও বুঝি সে ভুলে গিয়েছিল।

স্বর্ণেন্দু সোজা ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করে।

কুন্তী দেবী—

কুন্তী মুখ তুলে তাকাল।

চলুন—উঠুন—পাশের ঘরে চলুন—

স্বর্ণেন্দুই হাত ধরে সেদিন কুন্তীকে তুলেছিল।

পনের

পরবর্তীকালে একটা পত্রে কুন্তী লিখেছিল স্বর্ণেন্দুকে :

জান স্বর্ণেন্দু—তুমি সেদিন এসে আমার মায়ের মৃত্যুশয্যার পাশ থেকে হাত ধরে তুললে—আমার মনে হল—ভয় কি আমার, আর কাউকেই তো প্রয়োজন নেই আজ—তুমিই তো আছো। তুমি আমার আছো।

কানে কানে কে যেন আমায় বললে, কুন্তী তোর ভয় নেই—স্বর্ণেন্দু, তোর আছে—

তারপর কতদিন ভেবেছি—আমার জীবনের এত বড় একটা ব্যাপার কখনো আগে আমি উপলব্ধি করতে পারিনি কেন?

আমি এমনই অন্ধ যে এত বড় ভালবাসার সন্ধান পেলাম না। আচ্ছা, সত্যি করে বল তো, কবে থাকতে তুমি আমায় ভালবেসেছিলে আর আমার এমন কি সুকৃতি ছিল যে এত বড় ভালবাসা তুমি আমায় দিয়েছিলে?

এত বড় পুরস্কারের যোগ্য তো আমি নই—

ট্রেনটা একটু আগে একটা স্টেশনে থেমেছিল—আবার এখন

চলেছে।

সীতা ঘুম ভেঙে উঠেছে।

কুন্তীর কোল ঘেঁষে বসে জানালা-পথে বাইরে তাকিয়ে আছে—

হঠাৎ কুন্তীর হাতটা ধরে টেনে সীতা বলে, দেখ—দেখ মা—তারের উপর বসে আছে লাল পাখীটা কি সুন্দর—যাঃ, উড়ে গেল, ঐ যে, কোথায় গেল মা পাখীটা—

হাওয়ায় এলোমেলো সীতার মাথার চুলগুলো ঠিক করে দিতে দিতে সস্নেহে বলে, বোধ হয় ওর বাসায়।

বাসায় ওর কে আছে মা? ওর মা আছে?

নিশ্চয়ই আছে—

আচ্ছা মা?

কি—

আমরা কোথায় যাচ্ছি?

কলকাতায়—

কলকাতায় বুঝি আমাদের বাসা?

হ্যাঁ—

তবে এতদিন বাসায় যাওনি কেন?

সত্যিই তো, যায়নি কেন?

সে তো তার নিজের বাড়ি—যাওয়ার তো কোন বাধাই ছিল না—আর আজও তো নেই। তার সেখানে আজও যাবার ও থাকবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

কেউ তাকে সেখানে যেতে বাধা দিতে পারে না—সাধ্য নেই কারো বাধা দেবার।

তবে—

তাছাড়া সামান্য চাকরিই বা সে করছে কেন, আর আজ কলকাতায় কোথায় গিয়ে সীতাকে নিয়ে উঠবে ভেবে আকুল হচ্ছেই বা কেন—

আকুল তো সে নিজের জন্য নয়। সীতার জন্য—

সীতাকে কেন্দ্র করে যে প্রশ্নের কুৎসিত ঝড় উঠবে সেখানে সীতাকে নিয়ে গিয়ে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই—যে অপমানের কাদা সকলে মিলে তার ও সীতার গায়ে ছিটাবে—তা থেকে নিজেকে এবং সীতাকে বাঁচাবার জন্যই যে সে আর সেখানে ফিরে যেতে পারে না।

সীতার দায়িত্ব যে তার দায়িত্ব। সীতাকে যে সে গ্রহণ করেছে।

মানসীকে যে সে কথা দিয়েছে—সীতার গায়ে সে কোন কলঙ্কের দাগ লাগতে দেবে না।

হ্যাঁ, মানসীকে সেদিন সে কথা দিয়েছিল যে—

তা কি সে ভুলতে পারে।

মনে পড়ছে—

সবই মনে পড়ছে—

সাত মাস পরে হঠাৎ একদিন জরুরী তার এল লক্ষ্ণৌ থেকে—

শীগগিরি এস—মানসী।

তার পেয়েই ছুটে গিয়েছিল কুন্তী—এক মুহূর্তও আর দেরী করে-নি। সে ভেবেছিল মানসী বুঝি অসুস্থা—

একটা টাঙ্গা নিয়ে অনেক ঘুরে ঘুরে তবে বাসাটা খুঁজে পেয়েছিল কুন্তী।

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর ঐ দেশী একটা দাই এসে দরজাটা খুলে দিয়েছিল।

কাকে চাই মাঈজী—দাই জিজ্ঞাসা করে।

এখানে কি শিশিরাংশুবাবু থাকে ?

দাই সে কথার জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করে—মাঈজী কলকাতা থেকে আসছে কি না ?

কুন্তী হাঁ বলায় দাই তখন তাকে দোতলায় নিয়ে যায়।

দোতলায় ছোট দুটো ঘর পাশাপাশি—সামান্যই আসবাবপত্র ঘরে। দাইয়ের নির্দেশে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে থমকে দাঁড়াল কুন্তী—

জানালাটার সামনে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল মানসী। দাই ঘরে

ঢুকে ডাকে, মাঈজী—

কিরে দাই—

কথাটা বলে ফিরে তাকাতেই মানসীর সঙ্গে কুন্তীর চোখাচোখি হয় এবং মানসী মুহূর্তকাল কুন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই ছুটে এসে দু'হাতে উচ্ছল আনন্দে কুন্তীকে জড়িয়ে ধরে বলে, দিদিভাই!

কুন্তী দু'হাতে ছোট বোনটিকে জড়িয়ে ধরে।

আমি জানতাম দিদিভাই তুমি আসবে—ও বলেছিল, আসবে না—

কে—শিশিরাংশু?

হ্যাঁ—

কি বলেছিল?

তুমি নাকি আসবে না—সেদিন কথা দিলেও তুমি কথা রাখবে না আর আমি বলেছিলাম—নিশ্চয়ই তুমি আসবে—আসবে তুমি—

শিশিরাংশু কোথায়? তাকে দেখছি না।

সে তো এ সময় বাড়িতে থাকে না—

থাকে না?

না—সারাটা দিন কোথায় থাকে—অনেক রাত্রে আসে, মাঝে মাঝে তাও আসে না—রাতটুকু থাকে, তারপর ভোর হলেই চলে যায়—

কোথায়?

জানি না—

সে কি—তুই জানিস না সারাদিন সে কোথায় থাকে?

না—

কোথায় ও চাকরি করে হয়ত—

না—

তবে কি রিসার্চ করে?

না—

তার মানে, কিছুই করে না নাকি—

মানসী মাথা নীচু করে থাকে।

কুন্তী বুঝতে পারে শিশিরাংশু সম্পর্কে মানসী আর বেশী কিছু বলতে চায় না। কি ভেবে কুন্তীও আর পীড়াপীড়ি করে না।

তা, হ্যাঁরে—কুন্তী অতঃপর বলে, তোর ছেলে না মেয়ে হল কিছুই তো আমায় জানালি না। কথা ছিল জানাবি—আমি তাকে এসে নিয়ে যাবো। তা না হয় নাই জানালি—নাই দিলি। কিন্তু দিদিভাই বুঝি এতই পর হয়ে গিয়েছে, এতই দূরে চলে গিয়েছে তোর সন্তানের জন্য আশীর্বাদটুকুও তার আর প্রয়োজন নেই?

সেই জন্যই তো তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি দিদিভাই, মানসী বলে আশীর্বাদের কথা বলছ—আজ পৃথিবীতে খুকীর তোমার আশীর্বাদটুকুই যে একমাত্র সম্বল—সেই তো তার একমাত্র পরিচয়—

কথাগুলো বলতে বলতে মানসীর চোখের কোল ছুটো জলে ভিজে ওঠে।

মানু—

চল পাশের ঘরে—

পাশের ঘরে দোতলায় শুয়ে ঘুমিয়ে ছিল খুকী।

এক গুচ্ছ যুঁই ফুল যেন।

বাঃ বাঃ, ভারী সুন্দর হয়েছে তো—প্রশংসমান দৃষ্টিতে খুকীর দিকে চেয়ে চেয়ে কুন্তী বলে, দেখেছিস, তোর মত ওর গালে একটা তিলও আছে—বাবার গালে ঠিক অমনি একটি তিল ছিল, মনে আছে তোর?

হ্যাঁ—

তুই সেই তিলটি পেয়েছিস—আর তোর মেয়েও পেয়েছে—বাবার মত দেখতে তুই হয়েছিলি ঠিক, মা তাই বলত, তুই খুব সৌভাগ্যবতী হবি—বলতে বলতে লাল লাল ফোলা ফোলা গাল ছুটো খুকীর টিপে দেয় কুন্তী আদর জানিয়ে।

ঘুমের মধ্যেই মুখ ফোলায় খুকী।

দেখছিস, কেমন আবার গাল ফোলাচ্ছে—বলতে বলতে আবার খুকীর গাল টিপে দেয় কুন্তী।

খুকী এবারে ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ওঠে।

ওরে আমার সোনা—ওরে আমার মণি—ওরে সাতরাজার ধন—বুকে তুলে নিয়ে আদর করে কান্না থামায় কুন্তী।

কিন্তু তুই কি বল তো—আবার বলে কুন্তী, সংবাদটা দিবি তো, এখন কি দিয়ে ওর মুখ দেখি বল তো ?

কুন্তীর কথায় কোন সাড়া দেয় না মানসী।

ওর চোখ দুটো কেবল ছলছল করতে থাকে।

খুকীকে শান্ত করে দোলায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে ওরা আবার পাশের ঘরে ফিরে আসে এবং তখনই কথাটা বলে মানসী।

দিদিভাই—

কিরে ?

খুকীকে তোমার হাতে তুলে দেবার জন্যই কিন্তু আমি তোমায় ডেকে এনেছি জরুরী তার করে—

মানসীর কথায় চকিতে ফিরে তাকায় কুন্তী বোনের মুখের দিকে।

হ্যাঁ—দিদিভাই, মনে আছে আমায় তুমি কথা দিয়েছিলে ওর সব ভার তুমি নেবে—

মানসী—

হ্যাঁ দিদিভাই, ওকে তুমি নাও—আমি—আমি হয়ত ওকে বাঁচাতে পারব না—

সত্যিই তুই সেইজন্য আমায় ডেকে পাঠিয়েছিস ? বিস্ময়ের যেন অবধি নেই কুন্তীর।

বিয়ের আগে ওদের অমনি একটা কথা হয়েছিল বটে—ও কথাও দিয়েছিল কিন্তু সেটাকেই ওরা আজ সত্যি করে তুলতে চায় নাকি ! নিজের সন্তানকে মা অন্যের হাতে তুলে দিতে চায়—তাই কি সম্ভব, না কেউ তা পারে !

মানসী আবার বলে, ও চায় না খুকী এখানে থাকুক—ও জন্মান অবধি একবারের জন্যও ওর মুখের দিকে তাকায় নি—আর বারবার বলেছে তোমাকে ডেকে এনে ওকে তোমার হাতে তুলে দেবার জন্য—

শিশিরের কথা ছেড়ে দে, কিন্তু তুই—তুই পারবি ওকে ছেড়ে থাকতে ?

পারব—পারব দিদিভাই, আমি সব পারব ! আমি সব পারি—সব পারি—আমি তো ওর মা নই—আমি ওর কেউ নই—

মান্নু—

ওকে তুমি নিয়ে যাও, না হলে হয়ত আক্রোশের বশে কোনদিন আমার অলক্ষ্যে ওর গলা টিপে মেরে রাখবে—জানতেও পারব না আমি—

মান্নু—

তোমার কাছে থাকলে ও বেঁচে থাকবে—নাই বা দেখলাম ওকে, তবুও জানব ও আমার বেঁচে আছে।

আসুক সে, আমি তার সঙ্গে কথা বলব—

না,'.না দিদিভাই, তার সঙ্গে তুমি কথা ব'লো না—অপমান করবে সে—

কিন্তু কেন—রাখবেই বা না কেন ওকে নিজের কাছে, ওর জন্মের জন্য কে দায়ী, সেই তো সব চাইতে বেশী দায়ী। তার সন্তানের প্রতি তার চাইতে আর কার বেশী কর্তব্য—সে বাপ—

বাপ !—বাপই বটে—

তাছাড়া—কুন্তী আবার বলে, এ কেনই বা হবে—মা বাপ বেঁচে থাকা সত্ত্বেও কোন পাপ, কোন অপরাধ নয় অথচ অনাথের মত অন্যর কাছে সে পালিত হবেই বা কেন ?

আমার গর্ভে জন্মেছে—সেই দুর্ভাগ্যে—

দুর্ভাগ্য. কিসের দুর্ভাগ্য, কুন্তী সরোষ কণ্ঠে বলে, এ অন্যায়—জবরদস্তি—জুলুম, অবিচার—

জান দিদিভাই—ও কি বলে—

কি—

ও নাকি তার সন্তান নয়—

বলেছে ঐ কথা !

হ্যাঁ—যে মেয়ে বিয়ের আগে নিজেকে এক পুরুষের কাছে সমর্পণ করতে পারে, সে নাকি—

ছিঃ ছিঃ—বলিস না, আর বলিস না—

হয়ত কে জানে—আমাদের তুজনার মাঝখান থেকে ও চলে গেলে আবার ও আগের মত হবে—আমাদের তুজনার মধ্যে প্রতি মুহূর্তের এ অসহনীয় দূরত্বের অবসান ঘটবে, তুমি আর অমত কর না দিদিভাই, ওকে তুমি নিয়ে যাও—

কিন্তু ঐ তুধের শিশু, ওকে আমি কি করে মানুষ করি বল তো?

যদি বাঁচে ও তো তোমার কাছেই বাঁচবে—

শুধু তো তাই নয়, কি বলব আমি লোককে, কাকা কাকীমা—বাড়িসুদ্ধ সবাই যখন প্রশ্ন করবে, ও কে—কি জবাব দেব আমি বলতে পারিস?

বল, কুড়িয়ে পেয়েছ—রাস্তায় ওকে কুড়িয়ে পেয়েছ—অমন তো হয়—আর একান্তই যদি তোমার পক্ষে ওকে পালন করা বা ওকে তোমার কাছে রাখা না সম্ভব হয়, তবে ওকে কোন অনাথ আশ্রমে দিয়ে দিও—

মানু—আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে কুন্তী।

হ্যাঁ—যার বাপ মা থেকেও নেই—যে সন্তানের বাপ মার কাছে স্থান হল না—সে অনাথ আশ্রমে ছাড়া আর কোথায় যাবে—তাকে সেখানেই যে যেতে হবে—

ঠিক আছে—থাম তুই, আর বলতে হবে না—তোরা যখন ওকে রাখবিই না—আমিই ওকে নিয়ে যাব—

। ষোল ।

সেদিন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনি কুন্তী।

মুখে বললেও সত্যি সত্যিই যে নিজের সন্তানকে কেন এবং কত বড় তুঃখে এবং নিজে কতখানি অসহায় বলে কুন্তীর হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিল মানসী বুঝতে পারে নি।

বুঝতে পেরেছিল অনেক পরে—

শিশিরাংশুর কাছে মানসীর সমস্ত প্রয়োজন সেই দিনই ফুরিয়ে গিয়েছিল যেদিন যে মুহূর্তে তার দেহটাকে করায়ত্ত করতে পেরেছিল। এবং সেটা একেবারে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল মানসীর দেহে মাতৃত্বের সম্ভাবনাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে।

আকর্ষণ পরিবর্তিত হয়েছিল বিতৃষ্ণায়—

এমনিই হয়, আকর্ষণ ও লোভের বস্তু করায়ত্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আকর্ষণ ও লোভের মৃত্যু ঘটে ঐ সব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই।

মানসী সেটা বুঝতে পারে নি—সরল নির্বোধ মানসীর পক্ষে সেটা বোঝা সম্ভবও ছিল না তাছাড়া এক জাতীয় পুরুষ আছে সংসারে যাদের কোন কিছুকে পাওয়া বা করায়ত্ত করবার আগে যেমন আকাঙ্ক্ষা থাকে দুর্বার—তেমনি সেটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুর হয় সমাপ্তি। শুধু সমাপ্তি নয় সেই সঙ্গে বিকর্ষণের বিতৃষ্ণা!

শিশিরাংশু ছিল সেই প্রকৃতির পুরুষ। একান্ত স্বার্থপর।

শিশিরাংশু মানসীকে বিয়েই হয়ত কোনদিন করত না যদি সেই সঙ্গে সম্পত্তি ও অর্থের স্থূল স্বার্থের ব্যাপারটা অমন স্পষ্ট ভাবে না জড়িয়ে থাকত।

অতটা না হলেও কিছুটা আঁচ করতে পূর্বাহ্নে পেরেছিল বলেই কুন্তী ব্যাঙ্কের টাকাটার মোটা একটা অংশ মানসীর নামে ফিক্সড ডিপজিটে রেখে দিয়েছিল এবং মাসোহারার ব্যবস্থাটাও ছিল মানসীর নামেই।

ঐ দিন দ্বিপ্রহরেই খুকীকে নিয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে ট্রেনে চেপে বসল কুন্তী, সঙ্গে এলো দাই—সরাবতিয়া।

কুন্তী বুঝতে পেরেছিল খুকীকে রাখা নিজের কাছে মানসীর পক্ষে সত্যিই সম্ভব নয়—অন্য ভয় যত না থাক প্রাণের ভয় ছিল মেয়েটার।

শিশিরাংশুকে সন্তানের ব্যাপারে সত্যিই আর যেন মানসী বিশ্বাস করতে পারছিল না। রীতিমত সে ভীত-শঙ্কিত হয়েছিল কি এক অমঙ্গল আশঙ্কায়।

সত্যিই যদি তেমন কিছু ঘটে তখন আপশোষের যে আর সীমা-পরিসীমা থাকবে না।

মা হয়েও তাই মানসী দুধের শিশুকে নিজের বুক থেকে ছিনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে কুন্তীর হাতে তুলে দিয়েছিল।

বলেছিল, ও যেন আজ থেকে তোমাকেই ওর মা বলে জানে দিদি-ভাই—কোনদিন—কোনদিন ওকে বল না তুমি ছাড়া ওর মা আর কেউ ছিল, তাহলে হয়ত ও কোনদিনই ওর মাকে ক্ষমা করতে পারবে না—মায়ের নামে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে—

কুন্তী জবাবে বলেছিল, তবু তোকে বলা রইল মানু—মেয়েকে তোর যেদিন তুই চাইবি, নিয়ে আসবি—কোন সঙ্কোচ করিস না—কোন কিন্তু করিস না—

না দিদিভাই, আর না। পারলাম না যাকে মা হয়েও নিজের বুকে ধরে রাখতে—আর এ জীবনে তার দিকে হাত বাড়াব না। আজ থেকে ওর মার মৃত্যু হল—

কথাটা শেষ করতে পারে নি মানসী, ছুটে গিয়ে ঘরে খিল তুলে দিয়েছিল।

অনেক ডেকেছিল কুন্তী বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, মানু, মানু—দরজাটা খোল ভাই—একবার—

দরজা তো খোলেই নি। সাড়াও দেয়নি আর মানসী।

তবে আমি চললাম—

তবু সাড়া নেই।

অতঃপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিল খুকীকে বুকে নিয়ে কুন্তী।

চলন্ত ট্রেনের ফাস্ট ক্লাস কামরায় বসে আরো ভাল করে স্থির মস্তিষ্কে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা নতুন করে ভাববার চেষ্টা করে কুন্তী।

ভেবে যেন সত্যিই কূল পায় না—নিয়ে তো এল খুকীকে মানসীর কাছ থেকে—অতঃপর কি?

মেয়েটাকে যে নিয়ে এল—এখন সে কোথায় গিয়ে উঠবে—কলকাতার বাড়ীতে—কিন্তু সেখানে যখন প্রশ্নের ঝড় উঠবে—তীক্ষ্ণ কটূ সমালোচনা ও ব্যঙ্গোক্তিতে বিষ ঝরতে থাকবে তখন!—

তখন কি করবে এই মেয়েটাকে নিয়ে।

তাছাড়া একটা দুধের শিশুকে মার বুক থেকে নিয়ে এসে তাকে বাঁচিয়ে রাখা কি এতই সোজা?—প্রতিদিন—প্রতি মুহূর্তে হয়ত নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেবে।

সে সব সমস্যার সমাধান সে কেমন করে করবে!

ইতিমধ্যে মেয়েটা বোধহয় ক্ষিধের জন্য কাঁদতে শুরু করেছিল সরাবতিয়া তাকে বুকে নিয়ে বোতলে করে দুধ দিয়ে শান্ত করে।

চেয়ে চেয়ে দেখে কুন্তী।

ও তো বুঝতেও পারবে না কখন ওর ক্ষিদে পায়—কিসে ওর ব্যথা—কিসে ওর কষ্ট—কেন কাঁদছে—কিছুই তো বুঝতে পারবে না।

তাই তো, এ কি করলে সে—মানসী না হয় বলেইছিল—ও কেন তাকে নিয়ে আসতে গেল।

ট্রেন থামিয়ে চেন টেনে নেমে পড়বে কি। গিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে বলবে, না ভাই—এ আমি পারব না—এ দায়িত্বটা আমি নিতে পারব না।

বাঃ, কুন্তী চেয়ে দেখে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে, খুকী। সত্যি কি সুন্দর, যেন একগুচ্ছ ফুল।

মানসী বলেছিল, ওর চোখে আমি হত্যার সঙ্কল্প দেখেছি দিদিভাই—

না, না—কি বলছিস তুই, প্রতিবাদ জানিয়েছে কুন্তী।

হ্যাঁ—দিদি আমার থেকে তোমরা ওকে চেন না বেশী। শুধু খুকীকে কেন হয়ত আমাদের দুজনকেই ও এক সঙ্গে গলা টিপে মেরে রাখতে পারে। যেদিন থেকে ও আমার পেটে এসেছে কথাটা জানবার পর থেকেই ওর যে সে কি আক্রোশ—

ঐ সব কথা শুনেও শেষ পর্যন্ত সাহস হয় নি আর কুন্তীর খুকীকে

রেখে আসতে—

তাছাড়া কুন্তী—সেদিন মানসীর ওখানে গিয়ে তাকে অমনি অসুখী দেখে ভেবেছিল এবং মানসীর কথা শুনেও মনে হয়েছিল হয়ত ঐ খুকীর জন্যই মানসীর প্রতি শিশিরাংশুর অত আক্রোশ। ঐ খুকীকে দূরে নিয়ে গেলেই হয়ত সব আবার ঠিক হয়ে যাবে। ওদের পরস্পরের সম্পর্কটা সহজ হয়ে আসবে—সমস্ত সমস্যা মিটে যাবে তাই যদি হয় তো হোক—তাই খুকীকে শেষ পর্যন্ত সে সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিল।

কিন্তু খুকীকে সঙ্গে করে নিয়ে সে আর যাই করুক সে যে তাদের কলকাতার বাড়িতে গিয়ে উঠতে পারবে না তা সে জানত।

কলকাতার সেই বাড়িতে ফিরে যেতেও যেন আর মন চায় না কুন্তীর। বাড়িটা যেন ইদানীং একটা দুঃসহ যন্ত্রণার আবাস হয়ে উঠেছে।

অশান্তিকে এড়াবার জন্য একটু একটু করে সে বাড়ির সমস্ত অধিকার কাকা-কাকীমা ও তাদের সন্তানদের হাতে তুলে দিয়েছিল ইদানীং মায়ের মৃত্যুর পর এই কয় মাসে।

শুধু একটা ঘরে থাকা, ও দুবেলা দুটি খাওয়া।

গণেশ দুঃখ করেছে—বলেছে, ওদের তাড়িয়ে দাও দিদিমণি—কোথা থেকে এসে সব জুড়ে বসেছে—সব গ্রাস করে নিয়েছে—

কুন্তী বলেছে, ছিঃ, ওকথা বলিস না গণেশ—ওরা আমার কাকা-কাকীমা—

কিন্তু আমিও বলে রাখছি, এখনো ভাল চাও তো তাড়াও ও-গোষ্ঠী নচেৎ একদিন তোমাকেই এখান থেকে সরে যেতে হবে—

মনে মনে ভেবেছে কুন্তী ইদানীং কত সময়, সেই বোধ হয় ভাল—নিত্য পীড়ন আর যন্ত্রনা থেকে দূরে সরে যাওয়াই বোধ করি ভাল—তবু তো শান্তি পাওয়া যাবে।

তাছাড়া ঘরের আশা আর নেই মনের কোথাও। শিশিরাংশু তার ঘরে আগুন জ্বেলে দিয়ে গিয়েছে, কামনার পুষ্পকলি আগুনে ঝলসে

পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

নাই বা ফেরা গেল আর কলকাতার বাড়িতে।

ওখানে অভিশাপ আছে—মায়ের এত সাধের তৈরী বাড়ি—কটা বছরই বা মা ভোগ করতে পারল—বাপ কোথায় চলে গেল—না—ওখানে আর সে যাবে না।

॥ সতের ॥

কলকাতার বাড়িতে আর ফিরে গেল না কুন্তী।

জানালও না একমাত্র স্বর্ণেন্দুকে ছাড়া অন্য কাউকে কথাটা কলকাতার হোটেলে দুদিন থেকে সরাবতিয়া ও খুকীকে নিয়ে বের হয়ে পড়ল কুন্তী—সোজা গিয়ে উঠল যশিডিতে।

যশিডিতে সতীনাথের অনেকদিন আগে একটা বাড়ি কেনা ছিল।

একটা আদিবাসী দরোয়ানের জিম্মায় বাড়িটা তালা দেওয়াই থাকত—তবে বাড়িতে থাকবার এক প্রস্থ বিছানা ও বাসনপত্র থেকে সুরু করে সব ব্যবস্থা ছিল।

সেখানে গিয়ে উঠে স্বর্ণেন্দুকে একটা চিঠি দিল।

স্বর্ণেন্দু,

যশিডিতে এসে উঠেছি—সঙ্গে আছে মানসীর নবজাত শিশুকন্যা;—হতভাগিনী মেয়েটিকে ওর মা-বাপ রাখল না তাই নিয়ে এলাম সঙ্গে করে।

বাড়িতে উঠলাম না, কলকাতায় নানা কুৎসিত প্রশ্নের জবাব দিতে হবে বলে।

তোমাকে তবু জানালাম, কারণ আমার টাকার প্রয়োজন—মাঝে মাঝে যদি তুমি এখানে কিছু কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও বড় ভাল হয়।

আর একটা কথা, কেউ কোন কারণে যেন আমার এখানকার ঠিকানাটা না জানতে পারে। ইতি কুন্তী।

তারপর দীর্ঘ দুমাস বাদে আবার চিঠি দিয়েছিল কুন্তী স্বর্ণেন্দুকে।

স্বর্ণেন্দু,

তোমার চিঠির জবাব দিই নি বলে রাগ কর নি তো। রাগ করো না লক্ষ্মীটি। তুমি রাগ করলে আমি দাঁড়াই কোথা বল তো।

আমার আর দ্বিতীয় আশ্রয় কোথায় আর তুমি ছাড়া আমায় আর বুঝবেই বা কে?

তুমি লিখেছ এ নাকি আমার ইচ্ছাকৃত পলায়ন—আমার ইচ্ছাকৃত অজ্ঞাতবাস। যার নাকি কোন প্রয়োজনই ছিল না। আমার নাকি কাউকে ভয় করবার কিছুই নেই।

না স্বর্ণেন্দু—পলায়ন নয়—তবে অজ্ঞাতবাস বলতে পার।

সত্যিই এ আমার মাতৃত্বের তপস্যার অজ্ঞাতবাস।

সীতা—জান ওর নাম রেখেছি আমি সীতা—হ্যাঁ, এ আমার সীতার মা হওয়ার সাধনার জন্য অজ্ঞাতবাস বলতে পার, কি আশ্চর্য দেখ—

প্রথম যখন ওকে নিয়ে আসি—আমার সে দ্বিধা আর দোটানার কথা তো তুমি সবই জান—কিন্তু আজ এই দুমাসেই যেন মনে হচ্ছে মানসী ওকে গর্ভে ধারণ করলেও মা ওর বুঝি সত্যিকারের আমিই। আমারই সন্তান হয়ে বুঝি ও পৃথিবীতে এসেছে।

আমার ঘরে এসেছে।

শুধু খোলা সদর দুয়ার দিয়ে সকলের চোখের সামনে দিয়ে না এসে—গোপন খিড়কির ভেজানো দরজাটা ঠেলে এসে ঘরে প্রবেশ করেছে আমার।

ওর আমার মধ্যে পূর্ব জন্মের মা ও সন্তানের প্রতিশ্রুতি ছিল নিশ্চয়ই।

এ আমাদের উভয়ের প্রতিশ্রুতি পালন।

ও আমারই সন্তান—আমি ওরই মা। তাইতেই বুঝি আমরা পরস্পর পরস্পরকে খুঁজে পেয়েছি।

শুধু একটা ব্যাপার—এই ভাবে আমি আর বসে থাকতে পারছি না—তাই চাকরির সন্ধান করছি—

তৃতীয় চিঠি কুন্তীর—আবার দশ মাস পরে।

স্বর্ণেন্দু,

এত দিনের চেষ্টা আমার সফল হয়েছে—চাকরি পেয়েছি—

তুমি লিখেছিলে এ চাকরির আমার কি দরকার ছিল—ছিল বৈকি—সীতা যদি তার দাদুর স্বীকৃতি পেত তার মা ও বাবার হাত থেকে তবে সে গ্রহণ করতে পারত তার দাদু ডাঃ সতীনাথ চৌধুরীর অর্থ সাহায্য। কিন্তু তা তো সে পায় নি—

তাছাড়া সে একান্ত আমারই সন্তান যখন। আমারই দায়িত্ব যে তাকে মানুষ করে তোলা আমার নিজস্ব অর্থে—যে অর্থের ওপরে তার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

তাই এ চাকরি নিলাম।

ওর জীবনের পশ্চাতের জন্ম-পরিচয়টুকু একেবারে মুছে যাক—নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাক। জীবনের খাতায় কোন ঋণ যেন সেখানে না থাকে ওর, আমি এই চাই।

ও যেন আমার সন্তান—ওর মায়ের সন্তান বলে পরিচয় দিতে পারে এই আশীর্বাদই ওকে তুমি কর। কিন্তু সে তো হল ওর পরিচয়—ওর মায়েরও নিজস্ব যে একটা পরিচয়ের দরকার—তাই তোমার কাছে এবারে আমার ভিক্ষা—

আমার কপালে ও সিঁথিতে তোমার দেওয়া—আমার স্বামীর দেওয়া একটু সিঁদুর চাই।

অনুমতি চেয়ে রাখলাম যাবার দিন কপালে এঁকে নেব—

খুব জুলুম করছি, না?

আচ্ছা, তুমিই বল না—কুন্তী জুলুম তোমার ওপরে করবে না তো কার ওপরে করবে?

তাছাড়া স্ত্রীর যত জুলুম তো স্বামীর কাছেই। একথাটা নিশ্চয়ই তুমি স্বীকার করবে।

এক বছরের শিশুকে নিয়ে একা একাই এবারে সুদূর ইউ-পি-র এক

অখ্যাত ছোট জায়গায় একটা স্কুলে গিয়ে চাকরি নিল কুন্তী।

সরাবতিয়াকে ইচ্ছা করেই সঙ্গে নিল না, তাকে ছুটি দিয়ে দিল।

পিছনের কোন চিহ্নই সে রাখতে চায় না।

তারপরের পাঁচটা বছর—

ট্রেনটার গতি কমে আসছে—

রেলওয়ে ইয়ার্ড ও অনেক লাইন পাশাপাশি—নিশ্চয়ই কোন বড় জংশন স্টেশনে গাড়িটা এল।

হ্যাঁ, কোন বড় জংশনই হবে—দূরে কেবিনটা দেখা যাচ্ছে। গাড়িটা কাল ভোর নাগাদ কলকাতায় পৌঁছাবে। সেবারের মত এবারেও কোন হোটেলেই গিয়ে উঠতে হবে।

ইতিমধ্যে সে মনে মনে ঠিক করে—এবারে সীতাকে কোন কনভেন্টে রেখে দেবে সে।

হয়ত প্রথম কয়টা দিন কান্নাকাটি করবে—তারপর ধীরে ধীরে সবই ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু তখনো কুন্তী জানত না কলকাতায় তার জন্য কি সংবাদ অপেক্ষা করছে—এবং জীবন তার কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে আকস্মিক অচিন্তনীয় একটা মোড় নেওয়ার জন্য।

ঠিক ছয়টা বছর আগে যেমন আকস্মিক তার জীবনের সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে গিয়েছিল—তেমনি ঠিক আবার ঘটতে চলেছে একটা ঘটনা—

প্রথমে ভেবেছিল কুন্তী—কলকাতার তার হোটেলের ঠিকানাটা স্বর্ণেন্দুকে জানাবে না। পরে কি ভেবে যেন দিন চারেক বাদে কারখানায় ফোন করল।

কে?

স্বর্ণেন্দু—আমি কুন্তী—

কুন্তী—কোথা থেকে—

কলকাতার হোটেল থেকে—তারপরই হোটেলের ঠিকানাটা ও ঘরের নম্বর জানায় কুন্তী। অন্য পক্ষ শুধু শুনে যায়, কোন সাড়া দেয় না।

আসবে নাকি? কুন্তী শুধায়—

তুমি তো যেতে বললে না—

বড় লোভ হচ্ছে একটিবার তোমাকে আসতে বলি, কিন্তু—

কি—

সময় এখনো আসে নি—তাছাড়া আজকাল আমি সত্যিই বড় দুর্বল হয়ে গিয়েছি জান?

দুর্বল!

হ্যাঁ—নিজের উপরে আর বিশ্বাস নেই—

সে তোমার অহেতুক ভয়—

না, না,—সত্যি—বিশ্বাস কর—

যাক ও কথা, শোন—একটা সংবাদ বোধহয় তোমাকে আমায় দেওয়া কর্ত্তব্য—

সংবাদ!

হ্যাঁ—মানসীর সংবাদ।

কি—কি হয়েছে মানসীর?—বেঁচে আছে তো?

তা এখনো আছে, তবে—

তবে বল—থামলে কেন?

ফোনে কুন্তীর গলার স্বরটা উৎকণ্ঠায় যেন বুজে আসে।

চিঠি একটা লিখেছিল মানসী তোমাকে কারখানার ঠিকানায়—বাড়ীর ঠিকানায় লিখতে বোধহয় সাহস হয় নি—তারপর জানি না কি বিচিত্র কারণে পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের অদৃশ্য এক চক্রজালে ফেঁসে দীর্ঘ দিন বাদে চিঠিটা আমার হাতে এসে মাত্র পরশুর আগের দিন পৌঁছায়—

কি চিঠি—পড়েছ সে চিঠিটা—

পড়েছি—

কি লিখেছে?

বিশেষ কিছু না, কলকাতায় একটা ঠিকানা দিয়েছে—তোমাকে একটিবার গিয়ে তার সঙ্গে বিশেষ করে দেখা করতে জানিয়েছে—

আর কিছু লেখে নি?

না—তবে গতকাল অনেক কষ্টে খুঁজে খুঁজে রাত্রে সেই ঠিকানায় গিয়েছিলাম

দেখা হয়েছে?

হয়েছে—কুন্তী তোমাকে কথাটা আমার জানান উচিত তাই জানাচ্ছি—মানসী আজ মৃত্যুশয্যায়—

না—না—স্বর্ণেন্দু—কুন্তী কেঁদে ওঠে।

আমি তোমাকে ঠিকানা দিচ্ছি—পার তো অবিলম্বে তার সঙ্গে দেখা কর—অতঃপর স্বর্ণেন্দু ঠিকানাটা বলে দিল—বেলগাছিয়ার একটা অখ্যাত রাস্তা।

আমি যাব—আজই—এখুনি যাব—

আজই?

হ্যাঁ, আজই—

কিন্তু এই রাত্রে—

তা হোক—এই রাত্রেই যাব—উঃ তোমায় যদি না ফোন করতাম—একটা কথা—শিশিরাংশুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?

না—

সে ওখানেই আছে তো, না—

তাও জানি না।

। আঠের ।

সেই রাত্রেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় অনেক কষ্টে খুঁজে বের করে বাসাটা কুন্তী।

মিথ্যে বলে নি স্বর্ণেন্দু।

একটা অন্ধকার অপরিসর গলি।

ছোট একটা দোতলা বাড়ীর উপরের দুখানা ঘর নিয়েছিল মানসীরা।

মানসীরা, মানে মানসী আর একটা বুড়ী ঝি—মনোর মা। অনেকক্ষণ দরজার কড়া নাড়বার পর এক সময় মনোর মা এসে বকর বকর করতে করতে দরজাটা খুলে দিল।

চোখে অল্প দেখে মনোর মা, তার উপরে সিঁড়ির আলোটা এত অল্প যে ভাল করে সে দেখতেই পায় নি। ভেবেছিল বোধ হয় শিশিরাংশু।

বলে ওঠে, কেমন ধারা ব্যাপার বল তো তোমার বাবু—দুদিন পরে সময় হল—এদিকে মেয়েটা যে মরে—

আমি তোমার বাবু নই—কুন্তী বলে।

ও মা—আমি ভাবনু বুঝি বাবু—তা কে গা বাছা তুমি ?

আমাকে তো তুমি চিনবে না, তা এটাই কি শিশিরবাবুর বাসা ?

হ্যাঁ, বাবুর নাম তো তাই শুনেছি—

তোমার বাবু বুঝি দুদিন আসে না ?

সে গেরোর ফেরের কথা বল কেন বাছা, কেমন ধারা লোক বুঝি না, বৌটা মরছে আর তেনার দুদিন ধরে দেখা নেই। সেই যে দুদিন আগে এখুনি আসছি মনোর মা বলে বেইরে গেল, আর দেখা নেই তারপর—

বাড়িতে আর কে আছে !

মরবার জন্য ধুঁকছে বৌটা আর আমি—আর কে থাকবে ?

তোমার মা কোন ঘরে ?

উপরে—তা তুমি বাছা কে বললে না তো—

আমি তোমার মায়ের বোন—

বোন !

হ্যাঁ, মায়ের পেটের বোন—

ও—তা হলে তুমিই—তোমার জন্যই বোধ হয় এখনো প্রাণটা বের হয়নি—এলেই যদি বাছা তা এত দেরি করে এলে—

ছোট একটা ঘর।

অল্প শক্তির টিমটিমে একটা ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছে ঘরে, তারই আলোয় স্বল্পালোকিত ঘরটা।

একটা পালঙ্কের উপর মলিন শয্যায় শুয়ে ছিল পাশ ফিরে মানসী।

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ঘরে পা দিয়েই কুন্তী। মুখ থেকে তার কোন শব্দ বের হয় না।

মনোর মাই ডাকে, মা—

কেন মনোর মা—ক্লান্ত ক্ষীণ কণ্ঠে সাড়া দেয় মানসী।

দেখ গো চেয়ে কে এসেছে—

কে রে?

ফিরে তাকাল মানসী।

এ কি, কে শুয়ে ঐ শয্যায়, মানসী—না তার কঙ্কাল। শুধুমাত্র হাত কখানির উপর চামড়ার আবরণটা।

কালি-ঢালা কোটরগত চোখ—

কে?

মানু—

কে—দিদিভাই—এসেছ দিদিভাই—সত্যিই তুমি এসেছ!

চোখের জল রোধ করতে পারে না কুন্তী। সযতনে মাথাটা কোলের উপর তুলে নিয়ে বলে, আমাকে আগে জানাসনি কেন মানু—

আগে জানালেই কি তুমি আমাকে আমার দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করতে পারতে দিদিভাই?

মানু—

কাঁদছ কেন দিদিভাই—এ যে আমার পাপের ফল—

পাপের ফল—

তা বৈ কি, কিন্তু সেদিন কেন তুমি আমায় বলনি যে ওকে তুমি ভালবাসতে—

মানু—চাপা কণ্ঠে যেন চিৎকার করে ওঠে কুন্তী।

হ্যাঁ দিদিভাই—কেন ঐ কথাটা আমায় জানতে দাওনি—তবে তো এমনি করে তিনটে জীবন নষ্ট হয়ে যেত না।

কে—কে তোকে ঐ কথা বলেছে—ঐ শিশিরাংশু নিশ্চয়ই—

আর কে বলবে বল ?

কিন্তু তুই বিশ্বাস কর বোন—ও একেবারে মিথ্যা, অতবড় মিথ্যা আর হতে পারে না—ওর সমস্ত মিথ্যার মত ওটাও একটা মিথ্যা—

দিদিভাই—

হ্যাঁ, তোর কাছে আজ আর কিছু গোপন কবব না—তুই যেমন একদিন ওকে দেখে ভুলেছিলি—আমিও ঠিক তেমনি ভুলেছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস কর সে ভুল ভাঙতে আমার বেশী দেরি হয়নি আর তাইতেই সেদিন তোকে আমি বারবার ফেরাবার চেষ্টা করেছিলাম—কিন্তু তুই বুঝলি না—

কিন্তু—

আজ বুঝতে পারছি তোকে সেদিন সব কথা আমার স্পষ্ট করে বলাই উচিত ছিল—তবে হয়ত আজকের এই সর্বনাশটাকে তুই-আমি দুজনেই এড়াতে পারতাম, কিন্তু এভাবে তোকে আমি মরতে দেব না—কিছুতেই না—আমি এখুনি ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসছি। যাবার জন্য বোধহয় উঠে দাঁড়ায় কুন্তী।

কিন্তু তার যাওয়া হল না, হঠাৎ ঐ সময় একটা কাশি উঠল মানসীর।

কাশতে কাশতে গলা দিয়ে থকথকে রক্ত খানিকটা বের হয়ে এল।

দিদিভাই, সময় আমার ফুরিয়েছে—মিথ্যে আর তুমি ছুটোছুটি কেন করবে—ক্লান্ত কণ্ঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে মানসী, তার চাইতে আমার পাশে তুমি বস—কতদিন তোমায় দেখি না—

আসছি—আমি এখুনি আসছি ভাই—ঝড়ের মতই যেন ছুটে বের হয়ে গেল কুন্তী।

ট্যাক্সিটা ছাড়েনি কুন্তী—দাঁড়িয়েই ছিল—সেই ট্যাক্সিতে চেপে গিয়েই একটা ডাক্তারখানা থেকে ডাঃ মুখার্জীকে ফোন করল।

কে ?

ডাঃ মুখার্জী, আমি কুন্তী—ডাঃ চৌধুরীর মেয়ে—

কুন্তী—কোথা থেকে বলছ ?

বেলগাছিয়ার এক ডাক্তারখানা থেকে—আপনাকে কাকা, একবার এখুনি আসতে হবে—

কোথায় ?

ঠিকানাটা বলে দিল কুন্তী।

ঠিক আছে—ডাঃ মুখার্জী বললেন, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আসছি—

ডাঃ মুখার্জী এসে পরীক্ষা করে মানসীকে—কুন্তীকে ঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে গেলেন।

আমি সত্যিই দুঃখিত মা—

মুখার্জী কাকা—

দুটো লাংসয়ের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই মা—একেবারে ঝাঁঝরা —ক্যাভিটিতে একেবারে ভর্তি—it is too late মা—too late—

কোন আশাই কি নেই—

না মা—কোন আশাই নেই—অথচ এ রোগে আজ কি কেউ আর মরে—স্পষ্ট বুঝতে পারছি তেমন কোন চিকিৎসাই ওর হয়নি—most neglected case ! কিন্তু এমনটা কি করে হল সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না—

ডাঃ মুখার্জী অতঃপর সামান্য কিছু রোগ উপশমের মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করে বার বার দুঃখ প্রকাশ করতে করতে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

কুন্তী চুপ করে তারপরও কিছুক্ষণ বাইরের বারান্দায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে।

অন্ধকার আকাশের একটা ভগ্নাংশ বারান্দা থেকে চোখে পড়ে।

কিছু তারাও দেখা যায়।

সামনের খোলা ছাদটার ওদিকে একটা নারকেল গাছ—তার সরু

সরু দীর্ঘ পাতাগুলো যেন দুলে দুলে সিপ, সিপ, শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস মোচন করছে—

বাবা—মানুর ভার তুমি একদিন আমার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলে কিন্তু পারিনি আমি আমার কর্তব্য পালন করতে।

মানসী চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, ওকে ধরে রাখতে পারলাম না।

দিদিভাই—

ক্ষীণ কণ্ঠে ডাক শোনা গেল। মানসী ডাকছে ওকে।

কুন্তী গিয়ে ঘরে ঢুকল।

ডাঃ মুখার্জী বলে গেলেন তো কোন আশাই নেই—ম্লান বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে মানসী, আমি তো জানতামই—মিথ্যে তুমি দৌড়াদৌড়ি করলে। এস—ওই চেয়ারটায় এসে বস—

কুন্তী শয্যার উপর এসে বসতে উদ্যত হতেই বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি মানসী বলে, না—বিছানায় বস না তুমি—শুনেছি আমি একটু আগে, ডাঃ মুখার্জী কি বলছিলেন—তুমি ঐ চেয়ারটায় বসো—

কুন্তী কিন্তু নিষেধ মানে না, ওরই পাশে শয্যায় বসে। ওর মাথায় হাতটা রাখে।

আমাকে সত্যি কথাটা বল্ মানু—ও কি তোর আজ পর্যন্ত কোন চিকিৎসাই করেনি?

করবে না কেন, করেছে তো—মধ্যে মধ্যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এনে দিয়েছে—কিন্তু যার সারবার নয়—তার কি কোন ওষুধে কোন কাজ হয়, তুমিই বল—না হলে হোমিওপ্যাথিতে তো কত জনার সারে—

কোন বড় ডাক্তারকে ডাকেনি?

কি করবে বড় ডাক্তার—

তোর নামে মাসোহারা আসে না?

হ্যাঁ আসে তো।

আর তোর ব্যাঙ্কের টাকা?

সে তো কবে শেষ হয়ে গিয়েছে—কি একটা বড় রিসার্চ করছে তাতেই সব গেছে—ও কি বলে জান দিদিভাই—রিসার্চটা সাকসেস্‌ফুল হলে সেটা হবে যুগান্তকারী—সারা পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে চেয়ে থাকবে—

তা হলে সেই রিসার্চ নিয়েই সে ব্যস্ত?

হ্যাঁ—মনোর মা তো বোঝে না, দিন রাত খিট্‌ খিট্‌ করে।

কোথায় সে রিসার্চ করে, জানিস কিছু?

শুনেছি টালিগঞ্জে কোথায়—

ঠিকানাটা জানিস না?

ফোন নাম্বারটা জানি—বলে রেখেছিল খুব প্রয়োজন হলে ডাকতে—

ফোন নাম্বারটা বলে দেয় মানসী।

কুন্তী আবার শুধায়, লক্ষ্ণৌ থেকে কবে চলে এলি?

তা বছর দুয়েক হবে—ও থাকত কলকাতায় রিসার্চ নিয়ে ব্যস্ত আর আমি একা একা লক্ষ্ণৌতে নিত্য রোগে ভুগি—তাই তো নিয়ে এল আমায়—

কত দিন তোর এমনি অসুখ?

তা বছর তিনেক তো হবেই—তারপরই একটু কেমন ক্লান্ত কণ্ঠে টেনে টেনে ডাকে, দিদিভাই—

কি রে—

এখন—মানে বলেছিলাম ছয় বছরের তো হল, না?

সীতা তো—হ্যাঁ—

সীতা বুঝি নাম রেখেছ?

হ্যাঁ—

বেশ নাম—আমার জনমদুঃখিনী সীতা—

নিয়ে আসব—তাকে দেখবি?

ইচ্ছা করে, খুব ইচ্ছা করে কিন্তু—না থাক, এ যা ছোঁয়াছে রোগ—তা ছাড়া আমার নিঃশ্বাসে বিষ আছে—যেখানে আছে সেখানে সে

আমি জানি সুখেই আছে—

মামু—

দিদিভাই—

আমি এখুনি যাব আর আসব--ট্যাক্সি আমার দাঁড় করানই আছে—

কিন্তু দিদিভাই—

কিছু হবে না—আমি নিয়ে আসছি তাকে—তাছাড়া কটা ওষুধও আনতে হবে—

কুন্তী তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেল—এবং মনোর মাকে বলে গেল সামনে থাকতে।

। উনিশ ।

হোটেলের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিল সীতা।

সীতা—সীতা—মেয়েকে গায়ে হাত দিয়ে ডাকে কুন্তী।

কুন্তীর ডাকে ঘুম ঘুম চোখে তাকায় সীতা, মামণি—

চল—এখুনি এক জায়গায় আমরা যাব।

কোথায় মামণি?

সে একজনের কাছে—সে জান তোমাকে খুব ভালবাসে, মেয়েকে জামা পরাতে পরাতে কুন্তী বলে।

কে—মামণি সে?

সে—সে—আমি যেমন—ঠিক তেমনি একজন—শোন, তাকে তুমি মা বলে ডাকবে, বুঝেছ?

মা বলে?

হ্যাঁ—

কেন মামণি?

বাঃ, তার তো কেউ নেই—

কেউ নেই বুঝি?

না—তাই তুমি তাকে মা বলে ডাকলে তার কত আনন্দ হবে বল তো! ডাকবে তো?

ডাকব—

লক্ষ্মী মেয়ে তুমি আমার—

কুন্তী যখন সীতাকে নিয়ে মানসীর বাসায় পৌঁছাল মানসীর অবস্থা তখন হঠাৎ আরো খারাপ হয়ে পড়েছে—আরো বার দুই ইতিমধ্যে রক্তবমন করেছে কাশতে কাশতে।

জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে—চোখ মেলতে পারছে না পর্যন্ত।

ডাঃ মুখার্জীর প্রেসক্রিপশন মত ওষুধগুলো কিনেই এনেছিল সঙ্গে করে পথের মাঝে গাড়ি থামিয়ে কুন্তী।

ঘরে ঢুকে কুন্তী ডাকে, মানু—

কে—দিদিভাই—চোখ মেলে তাকায় মানসী।

তাড়াতাড়ি এক দাগ ওষুধ খাইয়ে দেয় কুন্তী মানসীকে।

কেন মিথ্যে আর ওষুধ খাওয়াচ্ছ দিদিভাই—বলতে বলতে এতক্ষণে কুন্তীর পাশে দাঁড়ান সীতার দিকে বুঝি মানসীর নজর পড়ে।

কে—কে—দিদিভাই—

ওই তো সীতা!

সীতা—কিন্তু চোখের দৃষ্টি আমার ঝাপ্‌সা হয়ে আসছে যে—

কুন্তী বলে সীতাকে, সীতা যাও সামনে—

সীতা আরো সামনে যায় মানসীর।

না, না—মানসী বলে, আর কাছে এস না—সীতা—

বলুন মা?

মা—মা—সীতা—

মা—

না মা—আমি তো তোমার মা নই—আ—আমি তো—তো—মার কেউ নই—কে—উ—ন—ই—সু—সু—খে থা—শেষ হয় না কথাটা —জড়িয়ে যায়, আবার একটা কাশি তারপরই খানিকটা রক্ত—

মাথাটা টলে পড়ে বালিশের উপর।

চিৎকার করে উঠে কুন্তী—মানু—

সীতা ডাকে, মা—

সীতাকে বুকের ওপরে টেনে নিয়ে কেঁদে ওঠে কুন্তী, ও আর সাড়া দেবে না সীতা—ও আর সাড়া দেবে না—

পাড়ার লোকদের সাহায্যেই কুন্তী শেষ ব্যবস্থা করে মানসীর এবং বেলা নটা নাগাদ ক্রিমেটোরিয়াম থেকে ফিরে আসে সব শেষ করে হোটেলে।

শিশিরাংশুকে খবর দেয়নি কুন্তী।

খবর তো আর নয় শেষ বারের মত দেখা করে একটা শেষ বোঝাপড়া শুধু।

শেষ বোঝাপড়া।

বুকের মধ্যে আক্রোশের একটা অগ্নি-দহন চলেছে যেন।

শিশিরাংশু, আমি তোমায় নিষ্কৃতি দেব না। আমি এত সহজে তোমায় ছেড়ে দেব না—তুমি শুধু মানসীকেই হত্যা করনি—আমাদের সুখের সংসারে তুমি আগুন ধরিয়ে দিয়েছ।

মানসীকে তুমি হত্যা করেছ—সেজন্য আদালতে যাব না আমি—আমিই করব তোমার—বিচার—

ফোন গাইড দেখে ফোন নাম্বারটা মিলিয়ে শিশিরাংশুর টালিগঞ্জের ঠিকানাটা খুঁজে বের করতে খুব একটা কষ্ট হয়নি কুন্তীর।

সে ঠিক খুঁজে বের করে, মূর এ্যাভিনু—

তার পর রাত আটটা নাগাদ হোটেল থেকে বের হয়ে মূর এ্যাভিনুর নির্দিষ্ট ঠিকানায় এসে পৌঁছাল।

জায়গাটা নতুন ডেভালপ হয়েছে—রাস্তাটা এখনও পাকা হয়নি।

নতুন নতুন সব বাড়ি, বেশ ফাঁকায় ফাঁকায় বাড়িগুলো পরস্পর থেকে।

একটা দোতলা বাড়ির সামনে নম্বর মিলিয়ে ট্যাক্সি থেকে নামল কুন্তী।

উপর থেকে সেতারের আওয়াজ আসছে না—

কড়া নাড়তে হল না বা বেল টিপতে হল না—দরজার সামনেই একজন হিন্দুস্থানী দরোয়ান বসেছিল। মেয়েমানুষ দেখে এবং বাবুর আত্মীয় শুনে পথ ছেড়ে দেয়।

সেতারের আওয়াজ শোনা যায়।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠে কুন্তী।

সামনেই একটা বড় ঘর দোতলায়—খোলা দরজা-পথে আলোর আভাস ও সেতারের আলাপ শোনা যায়।

সোজা গিয়ে কুন্তী ঘরে ঢুকল।

একটা সোফায় বসে শিশিরাংশু—পরনে পায়জামা ও পাঞ্জাবি—হাতে সুরার পাত্র আর সামনে এক সুন্দরী তরুণী বসে সেতার বাজাচ্ছে—

শিশিরাংশু—

কুন্তীর ডাকে চমকে মুখ তুলে তাকাল শিশিরাংশু, কে—

চিনতে পারছ না বোধ হয়?

তরুণীর হাতের সেতার তখন থেমে গিয়েছে—সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে সেতারটা রেখে।

আরে—what a surprise—কুন্তী চৌধুরী না?

হ্যাঁ, কুন্তী চৌধুরী।

শান্ত গলায় জবাব দেয় কুন্তী।

সুস্বাগতম—সুস্বাগতম— welcome— দেবী— welcome— দাঁড়িয়ে কেন—এস—বস—স্বপ্না—if you don't mind—একটু পাশের ঘরে যাও—

পাশের তরুণীকে লক্ষ্য করে বলে শিশিরাংশু। স্বপ্না ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

শিশিরাংশু—আমি তোমার কাছ থেকে তোমার জবাবটা জানতে এসেছি—এবারে বলে কুন্তী।

জবাব! প্রশ্ন করে নেশারক্তিম চোখে তাকাল শিশিরাংশু কুন্তীর

দিকে।

হ্যাঁ—

কিসের জবাব বল তো কুন্তী দেবী—গলার স্বরটা যেন একটু জড়ানো শিশিরাংশুর।

মানসীকে তুমি—

আজ আবার মানসীকে কেন সখী। She is dead—dead to me—সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে শিশিরাংশু।

তা কি আর জানি না—তাকে মেরে তারই পয়সায়—কোথায় মানসী বল?

মানসী!

হ্যাঁ—হ্যাঁ মানসী—কোথায় সে বল?

কেন তুমি জান না? তুমিই তো তার বাচ্চাটাকে নিয়ে এলে আর সে দিবারাত্র মেয়েটার কথা ভেবে ভেবে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল—

তাই বুঝি!

হ্যাঁ—তারপর একদিন মরে গেল। কেন আমি তো তোমায় চিঠি দিয়েছিলাম, পাওনি?

পেয়েছি বৈকি!

পেয়েছ?

হ্যাঁ—সেই চিঠি পেয়েই তো এসেছি—

চিঠি পেয়ে এসেছ—কেমন যেন হঠাৎ থমকে যায় শিশিরাংশু। চেয়ে থাকে কুন্তীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ—তবে তোমার নয় মানসীর—কুন্তী কথাটা শেষ করে।

মানসীর চিঠি—সে তোমায় চিঠি লিখেছিল বুঝি?

হ্যাঁ—আর তার মৃত্যুর কারণ যে তুমি—শেষ মুহূর্তে সেই জবানবন্দী সে দিয়ে গিয়েছে—লিখিত জবানবন্দী—

আর কিছু সে দিয়ে যায়নি?

দিয়ে গিয়েছে বৈকি—এবং এখান থেকে সোজা থানায় গিয়ে যখন সে জবানবন্দী পেশ করে বলব-you—তুমি আমার বোন

মানসীকে হত্যা করেছ—you killed her—

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় শিশিরাংশু, এবং কুন্তীর দিকে এগুতে এগুতে বলে, মানসীর কথা আজ যেতে দাও কুন্তী, if she is really dead, let her die—বিশ্বাস কর, তাকে আমি কোনদিন ভালবাসি নি—

থাম—

হ্যাঁ, বিশ্বাস কর, আমার মন জুড়ে তুমিই ছিলে, আজও আছ, I just played—played with her a nice little game—কি বলব একটি আস্ত sentimental fool—তোমার ঐ মানসী, তাই যখন হাতের মুঠোর মধ্যে পেলাম, দুদিন একটু শুধু ভোগ করেছিলাম মাত্র তার বেশী কিছু না—

তার বেশী কিছু নয়—না—তাই একটা নিরপরাধ মেয়ের জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে—

চিরকাল সব দেশে, সর্বত্র—তারাই তো victim হয়—তোমার মত একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে এতে অমন করে আশ্চর্য হচ্ছ কেন বল তো? ও সব কথা যেতে দাও—আজ তুমি এতদিন পরে এসেছ আমার ঘরে সেইটাই একমাত্র কথা হোক—let us celebrate that—অত দূরে দূরে দাঁড়িয়ে কেন—এস, পাশে এসে বস, কথাগুলো বলতে বলতে এগিয়ে যায় শিশিরাংশু কুন্তীর দিকে—

আর ঠিক সেই মুহূর্তে নিজের হঠকারিতার কথাটা মনে পড়ে এবং ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা যেন কেঁপে ওঠে কুন্তীর।

এ সে কি করেছে? হঠাৎ এভাবে এখানে সে আসতে গেল কেন?

শিশিরাংশু সোজা এসে ততক্ষণে বেরুবার দরজাটার দিকে পিছন ফিরে ওর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়, বলে, চল—যা হয়ে গিয়েছে সে তো আর ফিরবে না। তুমিও কিছুটা ভুল করেছ, ঝোঁকের মাথায় আমি তো করেছিই—কিন্তু সে তো আমরা অনায়াসেই ভুলে যেতে পারি—এস—

কুন্তীর বুকের ভিতরটা তখন কাঁপতে সুরু করেছে—সে বেরুবার জন্য পা বাড়ায় দরজার দিকে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা আড়াল করে শিশিরাংশু বলে ওঠে, সে কি, এসেছ যখন—নিশ্চয়ই যাবার জন্য

আস নি—

পথ ছাড় শিশিরাংশু—

তা কি হয় কুন্তী—আমার দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষার পর তুমি এলে—শিশিরাংশু—

আর আমিই কি এ সুযোগ এমন করে হারাতে পারি—বলতে বলতে হাত বাড়ায় শিশিরাংশু ভীতত্রস্ত কুন্তীর দিকে।

কুন্তী পিছিয়ে যায়—আর সেই মুহূর্তে শিশিরাংশু ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

না, না—

ভয় কি—হাসে শিশিরাংশু, এস—অনেক তৃষ্ণা এই বুকের মধ্যে জমা হয়ে আছে—

কুন্তী যত পিছোয়—শিশিরাংশু তত এগিয়ে যায়।

শিশিরাংশু লাফিয়ে কুন্তীর হাতটা ধরে ফেলে—আর ঠিক সেই মুহূর্তে কুন্তী ঝুঁকে পড়ে টেবিলের উপর থেকে Vat 69-এর বোতলটা তুলে নিয়ে শিশিরাংশুর মাথার উপরে সজোরে বসিয়ে দেয়—

অর্ধস্ফুট চিৎকার করে টলে পড়ে শিশিরাংশু।

মাথা কেটে একটা রক্তের ধারা সমস্ত মুখটাকে বীভৎস করে তোলে শিশিরাংশুর।

সেই সঙ্গে একটা উন্মাদ আক্রোশে যেন মানুষটা হিংস্র একটা জন্তুতে পরিণত হয়।

বীভৎস সেই রক্তমাখা মুখে কয়েকটা মুহূর্ত চেয়ে থাকে শিশিরাংশু তারপরই এগিয়ে গিয়ে ঘরের ড্রয়ার থেকে পিস্তলটা টেনে বের করে—

এগিয়ে আসছে শিশিরাংশু—পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে—ক্রমশঃ দুজনার মধ্যে ব্যবধানটা কমছে—

কুন্তীর ঠিক মনে নেই—কুন্তী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল উন্মাদিনীর মতই শেষ প্রতিরোধে শিশিরাংশুর উপরে এবং জাপটে ধরেছিল দু'হাতে তাকে।

তারপর একটা ধস্তাধস্তি—পিস্তল-সমেত শিশরাংশুর হাতটা

কামড়ে ধরেছিল কুন্তী—পিস্তলটা হাত থেকে মেঝেতে পড়ে যেতেই পাগলের মত ঝুঁকে পিস্তলটা তুলে নিয়ে সোজা গুলী চালিয়েছিল পরপর দুবার—

ধোঁয়া বারুদের গন্ধ—একটা আর্ত্ত চিৎকার—আর রক্ত—উঃ, সে কি রক্ত!

মাথাটার মধ্যে কেমন যেন ঘুরে উঠেছিল কুন্তীর।

সে টলে পড়ে যায়—

আর কিছু মনে নেই।

॥ কুড়ি ॥

বিচার হল কুন্তীর।

স্বপ্না সাক্ষী দিল--সে প্রত্যক্ষদর্শিনী—নিজের চোখে জানালা-পথে আনুপূর্বিক ঘটনাটা ঘটতে দেখেছে—পিস্তল দিয়ে হত্যা করেছে সে শিশিরাংশুকে সে রাত্রে।

কুন্তীও অস্বীকার করেনি।

হ্যাঁ, সে হত্যা করেছে শিশিরাংশুকে—তার একমাত্র বোন মানসীর অপমৃত্যুর প্রতিশোধ সে নাকি নিয়েছে—রক্তের বদলে সে রক্ত নিয়েছে—

সে বলেছে—হ্যাঁ—আমি হত্যা করেছি শিশিরাংশুকে—I killed him—দীর্ঘদিন ধরে তাকে আমি হত্যার স্বপ্ন দেখেছি—আমার প্রতিহিংসাকে আমি তৃপ্ত করেছি—now I am satisfied—আপনাদের বিচারে যা দণ্ড আমায় দিতে চান দিন আমায়—

স্বর্ণেন্দুকে সে ডেকে পাঠিয়েছিল মাত্র একদিন।

পুলিসের হাতে ধরা দেবার পর তাকে হাজতে নিয়ে যাওয়া হল।

এত বড় যে একটা ব্যাপার ঘটে গিয়েছে সে রাত্রে স্বর্ণেন্দু তার বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারেনি।

সকালে একবার স্বর্ণেন্দু হোটেলে কুন্তীকে ফোন করেছিল।

কুন্তী যেন বলেছিল, বিশেষ একটা কাজ আছে ঐ দিন—স্বর্ণেন্দু যেন পরের দিন আসে হোটেলে। পরের দিন দুপুরে একা একা তার নিজস্ব ষ্টুডিওতে বসে একটা ছবি আঁকছিল এমন সময় থানা থেকে টেলিফোন এলো।

হ্যালো—

স্বর্ণেন্দুবাবু কথা বলছেন?

হ্যাঁ—

একবার টালীগঞ্জ থানায় আসবেন—থানার ও. সি. কথা বলছি—

বলুন—

এখানে কুন্তীদেবী বসে আছেন—আপনাকে একবার এখুনি এখানে আসতে বলছেন—

থানায়!

হ্যাঁ—

কি ব্যাপার বলুন তো?

আসুন না একবার—

স্বর্ণেন্দু তখুনি বের হয়ে পড়ে থানার উদ্দেশে—কিন্তু মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে না।

হাজত থেকে কুন্তী তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। কিন্তু কেন!

যে পুলিস অফিসারটি স্বর্ণেন্দুকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল প্রহরীকে দরজা খুলে দিতে বলে তিনি স্বর্ণেন্দুকে ভিতরে যাবার জন্য ইঙ্গিত করলেন।

দিনের বেলাতেও টিমটিমে একটা ইলেকট্রিক আলোয় স্বল্পালোকিত ঘরটি।

একটা চৌকির উপর স্তব্ধ হয়ে হাজত ঘরের মধ্যে বসে ছিল কুন্তী।

স্বর্ণেন্দু পদশব্দে মুখ তুলে তাকাল।

স্বর্ণেন্দু থমকে দাঁড়ায় কুন্তীর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই—

মাথার চুল বিস্রস্ত—সমস্ত মুখে একটা অসহ্য ক্লান্তির ছোপ। এক রাত্রেই যেন অনেক বছর বয়স পার হয়ে এসেছে কুন্তী।

এস স্বর্ণেন্দু—মৃদু কণ্ঠে কুন্তীই আহ্বান জানায়।

স্বর্ণেন্দু বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—কোন কথা নেই তার মুখে। কুন্তী আবার বলে, তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি একটা গুরুদায়িত্ব তোমার কাঁধে তুলে দেব বলে—সীতা হোটেলে কাল রাত থেকে একা আছে—কান্নাকাটি সে করবে—তাকে তুমি তোমার কাছে আপাতত নিয়ে যেও—তারপর যেমন ভাল বোঝ তার একটা ব্যবস্থা করে দিও—

কুন্তী—অনেকক্ষণ পর মৃদু কণ্ঠে ডাকে স্বর্ণেন্দু।

বল।

আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না কুন্তী—

জান স্বর্ণেন্দু—মানসী মারা গিয়েছে—

মারা গিয়েছে?

হ্যাঁ—পরশু গিয়েছিলাম রাত্রে তোমার কাছ থেকে ঠিকানা পেয়েই তাকে দেখতে। পরশু রাত্রেই কয়েকবার পরপর blood vomit করে সে মারা গেল।

ওঃ—কিন্তু কালও তুমি ফোনে কিছু বললে না—

না বলিনি। তবে—মানসীর সেই মৃত্যুর—কুন্তী আবার বলে—সেই হত্যার প্রতিশোধ আমি নিয়েছি—ভগবান—ভগবানই আমায় সাহায্য করেছেন মানুষ হত্যার প্রতিশোধ নিতে নচেৎ হয়ত—

কি—কী করেছ তুমি—

শিশিরাংশুকে আমি হত্যা করেছি—

কুন্তী, অর্ধস্ফুট আর্তনাদ যেন মনে হয় স্বর্ণেন্দুর কণ্ঠে ঐ ডাকটা।

হ্যাঁ স্বর্ণেন্দু—তোমাদের বিচার তো আমি জানি তাই নিজের হাতেই বিচারের ভার নিয়েছিলাম—আর আমার কোন দুঃখ নেই, ভাবনা নেই, লজ্জাও নেই—

সত্যি—সত্যিই তুমি—কথাটা শেষ করতে পারে না স্বর্ণেন্দু—

সত্যিই—তারপরই আবার বলে, মানসীর আত্মা নিশ্চয়ই তৃপ্ত হবে.

আমি জানি। তুমি আমার সীতাকে কিন্তু দেখ—আর একটা কথা—

বল—

আজ নয়—সীতা যেদিন বুঝতে শিখবে—বড় হবে, সেদিন—

কি—

সেদিন তাকে বলো তার মায়ের হত্যার প্রতিশোধ একজন নিয়েছে--

কিন্তু এ তুমি কেন করলে কুন্তী ?

কেন করলাম—তুমি তা বুঝতে পারবে না স্বর্ণেন্দু, মেয়েমানুষের দুঃখটা মেয়েমানুষ ছাড়া তো কেউ বুঝতে পারে না। কত বড় আঘাতে মায়ের জাত হিংস্র হয়ে ওঠে—মানুষের বুকে গুলী চালায়—সে তুমি বুঝবে না—

বুঝি বা না বুঝি তোমাকে এমনিভাবে আমি শেষ হয়ে যেতে দেব না—

কি করবে—বড় বড় উকিল ব্যারিষ্টার দিয়ে আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে—কিন্তু তাতে করে সংসারের চোখে কি আমাকে তোমরা কেউ কলঙ্কমুক্ত করতে পারবে ? সংসারের ঘৃণা থেকে কি আমাকে তোমরা কেউ রক্ষা করতে পারবে ?

কুন্তী—

আর তাছাড়া—মনে মনে আমিও তাকে চরম দণ্ড দেবার জন্য—চরম প্রতিশোধ নেবার জন্যই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম। আঃ আজ সত্যিই আমি তৃপ্ত—এমনি করে সত্যি সত্যি যে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত মিটে যাবে বিশ্বাস করো স্বপ্নেও আমি সেদিন তা ভাবিনি।

এসব আমি কিছু জানি না—কিন্তু এ হতে পারে না—হতে আমি দেব না—

কি হতে দেবে না স্বর্ণেন্দু ?

এভাবে তোমাকে মিথ্যা কলঙ্ক মিথ্যা দণ্ড নিয়ে—

কে বললে মিথ্যা। মিথ্যা তো নয়—এতটুকু মিথ্যাও এর মধ্যে কোথায়ও নেই।

না—এ হতে পারে না—এ হতে আমি কিছুতেই দেব না। আবার বলে স্বর্ণেন্দু।

ছিঃ। তুমি না দিলেও আমি কি পারি এতবড় লজ্জা এতবড় কলঙ্ক নিয়ে তুচ্ছ একটা আইনের জোরে মুক্তি পেয়ে তোমার পাশে গিয়ে ইহজীবনে আর দাঁড়াতে—

কুন্তী—

না স্বর্ণেন্দু—সেই ব্যাপারটা ঘটে যাবার পর থেকে আমার কি মনে হত জান—এর চাইতে ভাল বুঝি আর কিছু হতে পারত না। হওয়া সম্ভব ছিল না। যাও আর দেরি করো না। কাল রাত থেকে হোটেলে সীতা একা আছে।

স্বর্ণেন্দু তবু চেষ্টার ত্রুটি করে না।

কিন্তু স্বর্ণেন্দুর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়।

কুন্তী যেমন হাজার অনুরোধেও তার সঙ্গে আর দেখা করে না তেমনি ধরা পড়ার পর প্রথম সে হত্যাপরাধকে স্বীকৃতি দিয়ে যে জবানবন্দী পুলিসের কাছে দিয়েছিল সে জবানবন্দীও আর প্রত্যাহার করে না সে।

সেই একই কথা: সে হত্যা করেছে—সম্পূর্ণ জ্ঞানে এবং ইচ্ছা করে শিশিরাংশুকে—

সে হত্যাকারিণী—

শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ পনের বৎসরের জন্য কারাদণ্ড হল।

জজ জুরীদের সঙ্গে একমত হয়ে ঐ দণ্ড দিলেন কুন্তী চৌধুরীকে—

সেদিনও স্বর্ণেন্দু চেষ্টা করেছিল শেষবারের মত একবার কুন্তীর সঙ্গে দেখা করতে কিন্তু কুন্তী দেখা করেনি।

প্রথমে কিছুদিন কুন্তী সেণ্ট্রাল জেলে ছিল—সেখান থেকে তাকে পাঠান হল বহরমপুর জেলে।

॥ একুশ ॥

তারপর দেখতে দেখতে দিনের পর দিন, সপ্তাহ, মাস—বছর কেটে গিয়েছে—

কুন্তী কারো কোন সংবাদ নেয়নি, কাউকে কোন সংবাদ দেয়নি—সে যেন নিজেকে একেবারে মুছে দিয়েছিল পৃথিবী থেকে।

একটার পর একটা চিঠি এসেছে স্বর্ণেন্দুর। কোন দিন সে চিঠিগুলোর একটিও খুলে পড়েনি সে।

একটার পর একটা চিঠি জমা হয়েছে কেবল।

দেহ ভেঙেছে—কপালে গালে বয়েসের চিহ্ন, বলি রেখা স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়েছে—মাথার চুল সব পেকে গিয়েছে।

সে যেন আর একটি মেয়ের ইতিহাস, আর একটি মেয়ের জীবন-কাহিনী।

কুন্তী নামটা পর্যন্ত তখন কারো আর বুঝি মনে নেই।

জেলের খাতায় নতুন নাম—নতুন পরিচয়। ১৯ নং কয়েদী।

জানানা ফাটকের ১৯ নং কয়েদী—

জেল কর্তৃপক্ষের কোন দুশ্চিন্তাই ছিল না কুন্তী সম্পর্কে।

কথা বলে না কারো সঙ্গে—কোন নালিশ নেই—অভিযোগ নেই—কোন নিয়মভঙ্গ নেই—বিদ্রোহ নেই।

তাই তাদের নিয়মকানুনও ১৯ নং কয়েদীর প্রতি কিছুটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল বুঝি আপনা হতেই।

. .

বছর সাতেক পরে--কুন্তী আবার কথা বলল।

মিঠুয়া এল কুন্তীর জীবনে।

বছর পনেরর একটি মেয়ে-

ঐ বয়েসে সে নাকি তার স্বামীকে বিষ দিয়ে হত্যা করেছে—

কুন্তী তো অবাক হয়ে গিয়েছিল কথাটা শুনে।

অমন সুন্দর ফুলের মত একটি মেয়ে—অমন সুন্দর হাসিটি যার

মুখে সর্বক্ষণ লেগে রয়েছে—সে কাউকে বিষ দিতে পারে নাকি—

মিথ্যা—হতে পারে না তা।

আর আশ্চর্য মেয়েটি—হয় হাসে না হয় গান গায়—

গান গায় সে, পরিচিত সব গান।

সেই প্রথমে শুধায় কুন্তীকে, তুমি কথা বল না কেন?

কুন্তী চেয়ে থাকে মিঠুয়ার মুখের দিকে।

গলায় বুঝি তোমার ব্যথা? মিঠুয়া আবার হাসতে হাসতে শুধায়।

কুন্তী মাথা নেড়ে জানায়, হ্যাঁ।

আহা—আমার মার মত বুঝি গলায় তোমার ক্যানসার হয়েছে? খুব ব্যথা করে?

কুন্তী আবার মাথা নাড়ে—

মিঠুয়া আর কিছু বলে না—গেয়ে ওঠে:

ধীরে বন্ধু, ধীরে ধীরে
চল তোমার বিজন মন্দিরে॥
জানি নে পথ, নাই যে আলো, ভিতর বাহির কালোয় কালো,
তোমার চরণশব্দ বরণ করেছি
আজ এই অরণ্য গভীরে॥

কুন্তী অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে—

মিঠুয়া গান গাইতে গাইতে কাজ করে—জেলের কাজ।

সেদিন গভীর রাত্রে বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি নেমেছে—চুপচাপ নিজের সেলের মধ্যে কুন্তী বসেছিল।

পাশের সেলেই মিঠুয়া থাকে হঠাৎ তার গান শোনা যায়:

অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে।
কখন তুমি এলে হে নাথ, মৃদু চরণপাতে।
ভেবেছিলাম জীবন স্বামী, তোমায় বুঝি হারাই আমি—
আমায় তুমি হারাবে না বুঝেছি আজ রাতে॥

গুন গুন করে গাইছে মিঠুয়া পাশের সেলে কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে টিপ টিপ বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে প্রতিটি গানের কথা স্পষ্ট শোনা যায়—

মিঠুয়া গাইছে :

যে নিশীথে আপন হাতে নিবিয়ে দিলাম আলো

তারি মাঝে তুমি তোমার ধ্রুব তারা জ্বালো।

সারাটা রাত ধরে সেদিন গান গেয়েছিল মিঠুয়া। একটার পর একটা গান।

খালি গান আর গান।

তার পরদিনই শুধায় কুন্তী, এখানে এলে কেন ?

বাঃ, আসব না, হাসতে হাসতে মিঠুয়া বলে, আমি যে আমার স্বামীকে বিষ দিয়ে মেরেছি—

না, না—

সত্যি—ওরা সবাই বললে—

কে, কে বললে ?

কেন আমার শাশুড়ী, আমার দেওর—ননদ—সবাই—সবাই বললে দুধের সঙ্গে নাকি বিষ দিয়ে তাকে আমি মেরেছি—

সত্যি—সত্যি তুমি মেরেছ ?

মিঠুয়া হঠাৎ যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়, বলে, কে জানে—হয়ত মেরেছি, না হলে আমার হাতের দুধ খেয়েই সেই যে সে শুলো আর উঠল না, আর ঘুম ভাঙল না। কিছুতেই যখন ডেকে ডেকে উঠল না, ডাক্তার এল, পরীক্ষা করে বললে মারা গেছে, আর—

আর—

বিষের ক্রিয়ায় নাকি তার মৃত্যু ঘটেছে, তার পরই পুলিসে ওরা খবর দিল জান।

তারপর ?

পুলিস এল, ওকে নিয়ে গেল—তারপর পরীক্ষা করে নাকি সত্যি সত্যি বিষ পেল—কিন্তু এটা ওরা বিশ্বাস করল না—বিকাশ আমাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিল—আর আমিও যে তাকে ভালবাসতাম—

বিকাশ বুঝি তোমার স্বামীর নাম ?

হ্যাঁ, বাবার ছাত্র ছিল সে, বাবাও আমার স্কুল মাষ্টার, মা কবেঃ

ছোটবেলা আমার মারা গেছিল, বাবার কাছেই মানুষ আমি। ঐ বিকাশ আসত বাবার কাছে পড়তে, মস্ত বড়লোকের ছেলে, ও আমায় বিয়ে করতে চাইল, তারপর একদিন আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। আচ্ছা কুন্তীদি—

কি ?

বড়লোকের ছেলের সঙ্গে গরীবের মেয়ের বিয়ে হয় না তাই না ?

কে বললে, কেন হবে না।

না—হওয়া কিন্তু উচিত নয়।

উচিত নয় ?

নিশ্চয়ই।

কেন ?

ও যে অসবর্ণ বিয়ে—ওতে কখনো মঙ্গল হয় না—সুখ হয় না।—নচেৎ আমার এমন হলো কেন। বাবা কিন্তু বুঝেছিলেন তাই বোধহয় বারবার এ বিয়েতে অমত করেছিলেন। কিন্তু—

কি ?

বিকাশ কিছুতেই শুনলো না।

আচ্ছা মিঠু ? তোমার বাবা চেষ্টা করেননি তোমাকে বাঁচাতে ?

বাবা, হ্যাঁ চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁর টাকা কোথায় অত, হেরে গেলেন—আমার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল, সেই খবর পেয়ে বাবা যে বিছানায় শুলেন আর উঠলেন না—

সেই থেকেই মেয়েটা যেন কাছে এসে দাঁড়াল কুন্তীর।

ভেবেছিল আর নতুন করে নিজেকে জড়াবে না। কিন্তু মিঠুয়া তাকে জড়াল। কঠিন বাঁধনে বেঁধে ফেলল যেন।

তারপর হঠাৎ একদিন ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট এল।

দেশ স্বাধীন হল।

অনেক কয়েদী ছাড়া পেল।

মুক্তির পরোয়ানা এল কুন্তীরও অনেকের সঙ্গে। কিন্তু মিঠুয়ার

এল না, তার মাত্র তিন বৎসর হয়েছিল।

কাল চলে যাবে কুন্তী ভোরে।

মিঠুয়াটা আজ আর একবারও আসেনি ওর কাছে।

ডাকলেও সাড়া দেয়নি, কথা বলেনি।

অথচ আশ্চর্য! সারাটা দিন কাজ করে আর গুনগুন করে গান গায়।

আজ কিন্তু মেয়েটার গলার শব্দ পর্যন্ত শোনা যায়নি একটি বারও।

দিনের বেলা ওকে ধরবার অনেকবার চেষ্টা করেছে কুন্তী কিন্তু ও ধরা দেয়নি—কুন্তীর কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

মনে মনে তাই ভেবেছে কুন্তী, ধরা দিল না, নাই দিক।

আবার মায়ার বাঁধন কেন, কেন মিথ্যা জড়ানো নিজেকে আবার—

একবার জড়িয়ে পড়েছিল, সেই বাঁধনের দাগই আজ পর্যন্ত মিলাল না।

বুকের নিভৃতে এখনো রক্তক্ষরণ করছে!

বাইরে যতই সে ভুলে থাকবার চেষ্টা করুক না কেন—একটি মুহূর্তের জন্যও কি এই কয় বছরে ভুলতে পেরেছে তাকে।

। বাইশ ।

সীতা!

চোখ বুজলেই যে মনের পাতায় মুখটা ভেসে ওঠে।

সীতা—তার সীতা—

আচ্ছা কত বড়টি আজ হয়েছে সীতা।

কত বয়স হল আজ সীতার, মনে মনে হিসাব করে কুন্তী, এক, দুই, তিন বছর করে হিসাব করে—

ঠিক ষোল বছরের হয়েছে সীতা এখন।

কেমন দেখতে হয়েছে?

তার মার মত কি?

মানসীর মতই তো দেখতে ছিল সীতা—কেবল গায়ের রঙটা পেয়েছিল ফর্সা।

সীতার কি আজও তার কথা মনে আছে—

পাগল—মনে থাকে না কি কারো না থাকতে পারে।

কতটুকুই বা বয়স তখন তার, নেহাৎ বাচ্চা। হয়ত সব মন থেকে ধুয়ে-মুছে গিয়েছে কবে।

সামান্য ঝাপসা স্মৃতিও হয়ত মনের কোথাও আজ আর অবশিষ্ট নেই তার।

আর থাকবেই বা কেন—

কে সে সীতার।

কেউ তো নয়। পর—নেহাতই পর—

তাছাড়া সে কি স্বর্ণেন্দুকে বার বার করে অনুরোধ করেনি—ও যেন ভুলে যায় আমাকে—

তবে—তবে আজ এ কান্না কেন?

সীতা তার কে—কেউ তো নয়—

বরং বলতে পারে তার—মানসীর জীবনের পরম শত্রু। শত্রু বইকি—সেই তো মানসী ও তার জীবনটাকে মরুভূমি করে দিয়েছে—

না, না—এ কি ভাবছে সে—

হঠাৎ চমকে ওঠে কুন্তী—

পাশের সেলে তখন মিঠুয়া গান গাইছে:

দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না—
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।

কান্নাহাসির দিনগুলি—

সত্যিই তো—রইল তো না। মনের সোনার খাঁচা তো শূন্য—কোন কিছুই তো নেই সেখানে—

কান্নাহাসির বাঁধন তারা সইল না—
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি॥

না—সত্যিই সে বেঁধে রাখতে পারেনি কাউকে—

সবাই চলে গিয়েছে জীবনের খোলা দ্বারপথ দিয়ে একে একে—

মা —বাবা—মানসী—সর্বশেষে সীতা—

সবাই চলে গিয়েছে একে একে।

এমন কি স্বর্ণেন্দু—তাকেও সে ধরে রাখতে পারেনি।

শিথিল মুঠি ছাড়িয়ে স্বর্ণেন্দুও চলে গেল একদিন।

অন্ধকার এক যবনিকা তার সমস্ত অতীতকে এক ভয়াবহ শূন্যতায় যেন গ্রাস করে রেখেছে।

মিঠুয়া তখন গাইছে ঃ

আমার প্রাণের গানের ভাষা
শিখবে তারা ছিল আশা
উড়ে গেল, সকল কথা কইল না
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।

কিন্তু তাই কি সে চেয়েছিল! তা তো সে চায়নি—

সে তো ভালবাসতে চেয়েছিল—ভালবাসা পেতে চেয়েছিল—শূন্য হাত ভরে নিতে চেয়েছিল—কিন্তু কোথা থেকে কি হয়ে গেল—

তার কথা কেউ বুঝল না।

কেন বুঝল না!

কার দোষ—কার?

তার—মানসীর, না শিশিরাংশুর?

শিশিরাংশু।

না—তার প্রতিও আজ আর তার কোন অভিমান নেই।

কারাবাসের এই কয় বৎসরে তিলে তিলে পৃথিবীর সকলের প্রতি কখন যেন সমস্ত অভিযোগ—সমস্ত অভিমান তার নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।

কারও উপরে আজ আর তার কোন অভিমান, কোন বিদ্বেষ নেই।

কারও কাছে কোন নালিশ নেই।

শিশিরাংশুর আত্মা—পরলোক বলে যদি কিছু থাকে তো সেখানে শান্তি পাক।

সে তার নিজের ছক-কাটা ভাগ্যের পথ ধরে এগিয়ে এসেছে—কেউ তো তার জন্য দায়ী নয়।

আর স্বর্ণেন্দু—

জানতে পারেনি সেদিন কুন্তী স্বর্ণেন্দুর কথা।

চিঠির পর চিঠি দিয়েছে স্বর্ণেন্দু কুন্তীকে কিন্তু একখানা চিঠিরও জবাব দেয়নি কুন্তী।

প্রত্যাশায় প্রত্যাশায় দিনের পর দিন থেকেছে স্বর্ণেন্দু কিন্তু কুন্তীর কাছ থেকে চিঠির জবাব আসেনি।

আশ্চর্য !

কুন্তী কেমন করে তাকে ভুলে গেল !

এক একবার নিদারুণ অভিমান হয়েছে স্বর্ণেন্দুর—প্রতিজ্ঞা করেছে মনে মনে যে চিঠি লিখলেও জবাব দেব না— লিখব না তাকে আর কোন চিঠি।

কিন্তু পারেনি শেষ পর্যন্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে—

আবার চিঠি দিয়েছে।

কিন্তু জবাব আসেনি।

ছুটে গিয়েছে জেলখানায় দেখা করবে বলে কিন্তু—জেলার এসে জানিয়েছেন—sorry—তিনি দেখা করবেন না—

কি বললেন ?

বললেন—স্বর্ণেন্দু বলে কাউকে নাকি তিনি চেনেন না—

বলছেন এ কথা !

হ্যাঁ—

আচ্ছা, বলেছিলেন যে সীতা এসেছে তার সঙ্গে দেখা করতে ?

বলেছিলাম—

কি বললেন ?

ঐ নামই নাকি কখনও তিনি শোনেননি।

শেষে আর বছর তিনেক যায়নি স্বর্ণেন্দু জেলে দেখা করতে—দেখা করবার চেষ্টা করতে।

সীতাও তো তখন বেশ বড় সড় হয়েছে।

সীতাকে স্বর্ণেন্দু তার সাধ্যমত মানুষ করে তুলেছে।

কুন্তীর অনুরোধ সে রক্ষা করেছে।

জেলে যাবার পর একটি মাত্র চিঠি দিয়েছিল কুন্তী তাকে।

সে চিঠিতে অনুরোধ জানিয়েছিল তার সীতাকে স্বীকৃতি দিতে—সামাজিক স্বীকৃতি।

তাই দিয়েছে স্বর্ণেন্দু।

পিতৃত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে।

সীতা জানে আজ স্বর্ণেন্দুই তার বাপ—সে স্বর্ণেন্দুরই একমাত্র মেয়ে—আর কুন্তী তার মা—

বড় হওয়ার পর, ভাল করে জ্ঞান হবার পর সীতা কুন্তীর অয়েলপেনটিংটা দেখিয়ে যখন শুধিয়েছিল স্বর্ণেন্দুকে, উনি কে বাবা? কার ছবি তোমার ঘরে?

ঐ তো তোমার মা—

মা?

হ্যাঁ, তোমার মা—

মা বলে মারা গিয়েছেন?

না তো—

তবে?

হারিয়ে গিয়েছেন তোমার মা।

হারিয়ে গিয়েছেন?

হ্যাঁ—

তবে মাকে আমরা কেন খুঁজি না বাবা?

খুঁজেছি অনেক খুঁজেছি কিন্তু পাইনি মা—তাকে খুঁজে আর পাইনি। কোথায় যে হারিয়ে গেলেন—

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দাও না কেন?

দিয়েছি বৈকি, তবু পাইনি।

আমি একদিন ঠিক দেখো মাকে খুঁজে বের করে আনব—

পারবি মা, পারবি?

পারব—নিশ্চয়ই পারব—

তাই আনিস মা—তাই আনিস। আমি পারলাম না, হেরে গিয়েছি—তুই তাকে খুঁজে আনিস—

আনব—

আরো বড় হয়ে কেন যেন সীতা আর সে কথা বলে না।

বোধ হয় ভুলে গিয়েছে—

কিম্বা সত্যি ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পেরেছে কোনমতে।

স্বর্ণেন্দু কিন্তু খোঁজ রেখেছিল বরাবর কুন্তীর।

কুন্তীর মুক্তি হবে তাও জানতে পেরেছিল। এবং মনে মনে স্থির করেছিল শেষ চেষ্টা একবার সে করবে।

তাই সম্ভাবিত মুক্তির দিন সকাল সকালই সে গিয়ে হাজির হয় জেলগেটের সামনে—

কিন্তু তখনো জানে না সে যে আগের দিন সন্ধ্যাবেলাই কুন্তী—১৯ নং কয়েদী ছাড়া পেয়ে চলে গিয়েছে।

চলে গিয়েছে?

হ্যাঁ।

কাল কখন?

তা বিকেল চারটে নাগাদ—অবিশ্যি আজই তার যাবার কথা কিন্তু বলে-কয়ে কালই সে চলে গিয়েছে।

কোথায় গিয়েছে কিছু জানেন?

না, তবে—

কি?

একটা চিঠি রেখে গিয়েছে—

চিঠি?

হ্যাঁ—স্বর্ণেন্দুবাবুর নামে—

আমারই নাম স্বর্ণেন্দু—কোথায়—কোথায় সে চিঠি—দিন—

জেলার ভদ্রলোক স্বর্ণেন্দুকে চিঠিটা বের করে দেন।

কুন্তীর চিঠি—

নীচে নাম সই করা কুন্তীর—

॥ তেইশ ॥

স্বর্ণেন্দু—

অনেক, অনেক অপরাধ তোমার কাছে আমার এবং সব অপরাধই

তুমি আমায় ক্ষমা করেছ—আজকের এই শেষ অপরাধটাও ক্ষমা করবে আমি জানি—

ক্ষমা কর।

পারলাম না—তোমার সামনে দাঁড়াতে পারলাম না—তাই চলে গেলাম।

তোমার প্রতিটি চিঠি পেয়েছি কিন্তু জবাব দিইনি।

তুমি তো জান—জবাব দেবার কিছু থাকলে নিশ্চয়ই আমি জবাব দিতাম।

জবাব দেবার কিছু ছিল না বলেই দিইনি—

জান স্বর্ণেন্দু—আজ আমার কি মনে হচ্ছে জান?—কার উপরে প্রতিহিংসা আমি নিলাম—কেনই বা নিলাম—

যাক—আজ আর সে কথা ভেবে লাভ কি—

এই চিঠির মধ্যে একটা চিঠি দিলাম—সীতা আমার সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশন হবে—সব সে পাবে।

তুমি ব্যবস্থা করে দিও।

সত্যি বড্ড দেখতে ইচ্ছা করছে একবার শেষবারের মত তাকে কিন্তু তার উপায় নেই।

আর একটা কথা। আমার খোঁজ কিন্তু আর কর না লক্ষ্মীটি—

আর পার তো আশীর্বাদ করো তোমার কুন্তীকে। পরজন্ম বলে যদি কিছু থাকে সেদিন যেন আজকের মত এমনি করে তোমাকে পেয়েও হারাতে না হয়।

এমনি করে ঘর-বাড়ি-ভালবাসা—স্নেহ সব কিছু দু'হাত ভরে পেয়েও শূন্য বুকে হাহাকার নিয়ে জীবনটা যেন আমার নিঃশেষ হয়ে না যায়।

তোমার—চিরদিনের কুন্তী।

ক্লান্ত অবসন্ন ধুলোয় ভরা কাঁচা সড়ক ধরে কুন্তী তখনও হেঁটে চলেছে।

একা একা হেঁটে চলেছে।

পাছে স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে দেখা হয় এবং দেখা হলে যদি না এড়ান যায় তাকে তাই আগের রাত্রেই জেল থেকে বের হয়ে এসেছে কুন্তী অনেক অনুনয়-বিনয় করে জেলার ভদ্রলোককে।

মিঠুয়ার গানটা কানে ভাসছে যেন এখনও :

এত বেদন হয় কি ফাঁকি
ওরা কি সব ছায়ার পাখি।
আকাশ-পরের কিছুই কি গো রইল না
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি ॥

বাড়িতে এসে সংবাদটা পেল স্বর্ণেন্দু।

ছুটে আসে সীতা—বাবা—বাবা—জান—

কি ?

মা—

মা—

হ্যাঁ—মা, আমার মা এসেছিলেন—

কোথায় ?

এখানে। এখানে এসেছিলেন—

কখন ? কবে ?

ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় যেন স্বর্ণেন্দু ভেঙে পড়ে।

কাল রাত্রে—আমি তখন ঘুমাচ্ছি।

সত্যি—

হ্যাঁ বাবা, সত্যি—

সত্যিই এসেছিল কুন্তী।

ঘুমাচ্ছিল সীতা তার ঘরে—মনোর মা এসে তাকে ডেকে তোলে।

সীতা—ওঠ—ওঠ শিগগির ওঠ—

ঘুম ঘুম চোখে বিস্ময়ে মনোর মার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করে।

কি হয়েছে মনোর মা ?

দেখবি আয় হতভাগী কে এসেছে—

কে ? কে মনোর মা ?

দেখবি আয় না—শিগগিরি আয়—

নীচের ঘরে দাঁড়িয়েছিল কুন্তী—

সর্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত—চোখে মুখে চুলেও ধুলো। মাথায় খদ্দরের শাড়ির ঘোমটা।

সীতা কিন্তু ঠিক চিনেছিল—দেখেই চিনেছিল—হুবহু বাবার ঘরের

ছবির সঙ্গে যেন এক।

মা—

সীতা—

ছুটে গিয়েছিল সীতা। ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সীতার বুকে।

মা—মাগো, এতদিন কোথায় ছিলে মা? কেন আসনি এতদিন? আমি, বাবা—তোমাকে কত জায়গায় খুঁজেছি—কত ডেকেছি—

সীতা—

কেন মা?

আমাকে তুমি ডেকেছ—খুঁজেছ?

হ্যাঁ—কত! তুমি কেন হারিয়ে গিয়েছিলে মা। চল মা—উপরে চল—

এখন নয় মা—

কেন?

আমার একটু কাজ আছে—সেটা সেরে ভোরবেলা আসব—

না—না, তুমি আর যাবে না—তুমি গেলে আসবে না—

আসব রে আসব—

ঠিক তো।

হ্যাঁ—

ফাঁকি দিচ্ছ না?

না রে, না—

স্বর্ণেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে সীতা বলে।

কিন্তু বাবা এত বেলা হয়ে গেল, মা তো এখনো এল না—

স্বর্ণেন্দু কুন্তীর ফটোর দিকে চেয়ে থাকে, মনে হয় কুন্তী যেন হাসছে।

কুন্তী হাসছে—

সীতাকে বলে গিয়েছে কুন্তী, সে আসবে। সে নাকি আবার ফিরে আসবে।

কুন্তী—সত্যিই তুমি আসবে তো? এসো ফিরে এসো কুন্তী—

স্বর্ণেন্দুর দু চোখের কোল বেয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

বাবা—মা আসবেন নিশ্চয়ই তাই না?

হ্যাঁ—আসবেন বৈকি। নিশ্চয়ই আসবেন।

স্বর্ণেন্দু তখনও নিঃশব্দে ফটোটার দিকে চেয়ে থাকে।

শেষ